রাত্রির আকাশে সূর্য

রাত্রির আকাশে সূর্য

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিবাদন গ্রন্থবিভাগ

রাত্রির আকাশে সূর্য

প্রচ্ছদপট
: কিশোর শিল্পী কমল শেঠ
প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৫১
অগাস্ট্, ১৯৪৪
প্রকাশক ও
মুদ্রাকর
কুমার ভট্টাচার্য
অভিবাদন গ্রন্থবিভাগ
১২, খুরুট রোড, হাওড়া
মুদ্রালয়
বিজয় প্রেস
১২. খুরুট রোড, হাওড়া
মূল্য পাঁচ সিকা

এই লেখকের
চন্দ্রসূর্য
কবিতার বই

কাহিনী নয়, কাহিনীর ভূমিকা মাত্র।

সন্ধ্যার দিকে বলাই-এর দোকানে একটি আড্ডা বসে। দোকানটি মুদিখানা। তবুও রোজকার প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়—চুলের ফিতে থেকে টোট্‌কা ওষুধ পর্যন্ত। তিন পুরুষের দোকান, চলে ভাল—তবু গাঁয়ের মধ্যে এখনো একখানা দোতালাও তুলতে পারেনি বলাই। কারণ লোকটা ধর্মভীরু। জ্ঞান হওয়া ইস্তক কারবারে ঢুকে গতানুগতিক পথে জীবনের বিয়াল্লিশটি বছর ও পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু আজো ওর হাত কাঁপে কারুর গলায় ছুরি দিতে।

গ্রামের চলতি আবহাওয়ায় যারা মুখ তুলে সমালোচনা করতে পারে না, বা ছেলে ছোকরাদের আড্ডায় হই-হুল্লোরে গা ভাসাবার মত জীবনের উৎসাহ যাদের নিঃশেষিত, একমাত্র তারাই এখানকার নিয়মিত সভ্য।

খদ্দের নেই, কেউ এসেও পৌঁছায়নি এখনো। বাধ্য হয়ে বলাই বসে বসে ঠোঙা বানাচ্ছিল। নিজের প্রয়োজনে লাগলেও ঠোঙা ও বিক্রি করে।

হঠাৎ ব্যস্তভাবে প্রবেশ করলো নীলু খুড়ো আর লক্ষ্মণ দাশ।

মুখ তুলে বলাই বললে, বসো খুড়ো, আমিই পাড়চি। কাটা কাগজ আর আঠার বাটিটা সে একপাশে সরিয়ে রাখলো।—হরেকেষ্টর মন্ত্রীকে যা কাবু কাল করেছিলে! আচ্ছা, এসো দেখি আজ আমার সংগে—

সে উঠে দাবার ছক পাড়বার জোগার করলো। কিন্তু বাধা দিলে লক্ষ্মণ।

—রেখে দাও তোমার গজ আর মন্ত্রী। বলি, খবর-টবর রাখো কিছু? থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় নিয়েই ত পড়ে আছো। আর এদিকে যে—ধপ্ করে লক্ষ্মণ জলচৌকিটার ওপর বসে পড়লো।

চোখ মুখ তার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর, ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরথর করে, কপালটাও দপ্‌দপ্‌ করছে যেন। সে যে বেশ উত্তেজিত তা সহজেই বোঝা যায়।

বিস্মিত হয়ে বলাই বললে, খবর? কী খবরের কথা তুমি বলচ?

—ছিদাম এসেছিল? পাশ থেকে নীলুখুড়ো জিজ্ঞাসা করলো।

—কই, না' তো?

—আর আসবেই বা কী করে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে নীলু খুড়ো,—এ বয়সে যে-আকাশটা ওর মাথায় ভেংগে পড়লো।

নীলুখুড়ো আর কিছু বললে না—লক্ষ্মণও নির্বাক। নির্বোধ হয়ে গেছে বলাই, কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। অর্থহীন চোখে সে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো শুধু।

—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, খুড়ো। একটু থেমে বলাই বললে।

—আর বুঝেই বা কী হবে? যারা বুঝলে, কী করলে তারা? নীলু খুড়ো বললে।

লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বলাই বললে, ব্যাপার কী লক্ষণ?

—ছিদামের সব্বনাশ হয়েছে?

—সব্বনাশ! কেন, কী হল?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নীলুখুড়োর দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণ সহসা প্রশ্ন করলে, কিন্তু এ অন্যায়ের কী বিচার হবে না খুড়ো?

বিষন্নকণ্ঠে জবাব দিলে নীলুখুড়ো, রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাহলে বিচার কে করবে লক্ষণ? তুমি, আমি?...টিকে ধরাতে যাদের আগুন জোটে না!

—কিন্তু, একটু উত্তেজিত স্বরে লক্ষ্মণ বললে, কিন্তু এত বছর ধরে যে জমিতে ও চাষ করে এল, যে বাস্তুভিটেয় সন্ধেপিদীম দিলে, আজ এক হুকুমে তার ওকালতনামা লিখে দিতে হবে? কেন? জমিদার তো তার পাওনা গণ্ডা চিরকাল বুঝেই নিয়েছে, ফাঁকি তো ছিদাম কোথাও দেয়নি।

—ফাঁকি না দিলেও ফাঁক পড়ে লক্ষ্মণ, বিশেষ করে, রাজা-প্রজার সম্পর্ক যেখানে।

—তব্ এর কি প্রতিকার হবে না, খুড়ো? ভগবান কী নেই?—

—ভগবান কেন থাকবেন না! নীলুখুড়ো হাসলো, কিন্তু তিনি থাকেন ওপরে, গরীবকে দেখেন না। তাঁকে শুধু পূজোই দাও, পেসাদ পাবার আশা রেখো না।

নীলুর কথা ঠিক বুঝতে পারলো না লক্ষ্মণ। সে আবার বললে, ধরো, আদালতে যদি পেতিশন করা হয়?

—ফল হবে, এখন যে পঞ্চাশটি ট্যাকা পাচ্ছে সেটাও যাবে মারা। নিজের পাঁঠা যেদিক দে ইচ্ছে কাটবার অধিকার আছে—এই কথাটাই জমিদার আদালতে বলবে।

এতক্ষণ বাদে বলাই আবার কথা কইলো, তোমাদের কথা আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না খুড়ো। ছিদামের কি হয়েচে খুলেই বল না বাপু।

ছিদামের হয়েছে অনেক কিছুই।

প্রায় পঁচিশ বিঘা ধানজমি সে ও তার গত তিনপুরুষ চাষ করে আসছে। অর্থাৎ জমিদারের নিকট পাওয়া ওই জমিখণ্ডকে কেন্দ্র করেই তার কোনো এক পূর্বপুরুষ লক্ষীন্দর হাজরার এই গ্রামে পত্তনীস্থাপনের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। তারপর পুরুষানুক্রমে এই ধারা অব্যাহত

রয়েছে। এত শুধু জমি নয়, মা বসুমতী,—তার লক্ষ্মী। বৎসরান্তে সোনার ফসলে তার ক্ষুধায় অন্ন দেয়, পরিধানে দেয় বস্ত্র। পিতা-পিতামহের পুণ্যপদক্ষেপে এর প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। পূর্ণ শরতে এর কচি কচি শীষের দিকে তাকিয়ে শৈশবে কত স্বপ্নই না দেখেছে ছিদাম, যৌবনে এর উর্বর বুকে লাঙলের সুতীক্ষ্ণ ফলা চালাতে চালাতে কত স্বপ্নের নীড়ই না গড়েছে মনে মনে, আর আজ জীবনের শেষ সীমায় এসে একে আশ্রয় করেই বেঁচে আছে। এর সর্বাংগে জড়িয়ে আছে. প্রিয়-জনের প্রিয় পরশ।...

কিন্তু জমিদারের নতুন আদেশ এসেছে যে তিনি এবার থেকে পূব-পশ্চিমের সীমানার তিন হাজার বিঘে জমি একত্র করে বিরাট কার্পাসের চাষ সুরু করবেন। আধুনিক শিক্ষিত তরুণ তিনি,—তাই পূর্বাহ্ণেই বুঝতে পেরেছেন যে উৎপাদনের আধিক্য হেতু বাজার মন্দা পড়ার সম্ভাবনা ষোল আনা। কাজেই এ সুযোগে কার্পাসের চাষে লাভের আশা বেশী। তাই ছিদামের প্রতি (শুধু ছিদাম নয়, আরো প্রায় শ'দুই কৃষকের প্রতিও) আদেশ হয়েছে এবারকার আমন কাটা হয়ে গেলে ও জমি মালিককে ফিরিয়ে দেবার জন্য। এবং সেই সংগে তার বাস্তভিটাও। খেসারত হিসেবে সে অবশ্যি জমিদারের কাছ থেকে কিছু টাকাও পাবে, এমন কী ইচ্ছে করলে জমিদারের এই নবপরিকল্পিত কার্পাসের চাষে ঠিকে কাজও করতে পারে।

ঠিকে!

ঘরের লক্ষ্মীকে পরের হাতে তুলে দিয়ে তারই সেবাইত হয়ে থাকা!

অর্থাৎ নিজ বাসভূমে পরবাসী! যেখানে নিজের ছিল অবাধ কর্তৃত্ব আজ সেখানে পরের হুকুম মাফিক যন্ত্রের মত কাজ করা!—এ সে মেনে

নেবে কেমন করে? আর মা বসুন্ধরাই বা সইবেন কেন এমন ব্যভিচার!

বহুবার সে করলো জমিদারের বাড়ীতে হাঁটাহাঁটি, হাতে পায়ে ধরে করলো অনেক কাকুতি-মিনতি,—কিন্তু নির্বিকার বিধানদাতা। অবশেষে সে জমিদারের দ্বারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে রইলো।

জমিদার বললেন, তোর একারই কী এমন ক্ষতিটা হল শুনি? চাষই যদি নেহাৎ করতে ইচ্ছে তো আমার এখেনেই না হয় করিস! আর বোকার মত কেবল লাঙল চালালেই হয় না, সব দিক ভেবে চিন্তে এগুতে হয়। বিজ্‌নেস্ মার্কেট ফলো করতে হয়, ডিমাণ্ড-সাপ্লাই-এর কোশ্চেন আসে—যাকগে ও সব কথা তুই বুঝবিনে। তবে জমিগুলো এবার থেকে আমি নিজেই চাষ করাবো এবং লার্জ স্কেল প্রডাক্‌শন্ মেথডে—দু'দশ বিঘে করে নয়, একেবারে তিন হাজার বিঘে এক সংগে। এ ছাড়াও অবিশ্যি আমার আরো প্ল্যান আছে, আছে আরো হাই এ্যাম্‌বিশ্যন। এমনি বহু কথাই জমিদার বলেছিলেন যার অনেক কিছুই ছিদাম বোঝেনি।

—কিন্তু হুজুর, আমার এই পঁচিশ বিঘে আপনাকে দয়া করতেই হবে। নইলে আমি বাঁচবোনা, এতোকালের বাস্তু আমার—

—বাপ পিতাম'র বাস্তু তুমি ত আর একাই ছাড়চোনা হে, ওদিকে নিমাই, অবিনাশ, কেষ্টদাশ, গৌরচন্দ্র, বিভূতি, ভোলানাথ সবাই ত আছে—কিন্তু কই কেউ ত তোমার মত এমন ছেনালি করেনি? —কারণ, লাভ ত এতে প্রজারই। আমার জমি আমি নিলাম, তবু এর জন্যে কিছু খেসারত ওরা পাবে। বেকারও থাকবে না, ইচ্ছে করলে ঠিকে কাজও—

কান্নায় ভেঙে পড়লো ছিদাম, আমায় ছেনাল বলবেন না বাবু।

ওরা ও কাজ করতে পারে,—ক’পুরুষ ওরা আবাদ করচে ? আর মা’র নেমকহারাম ছেলেরও তো অভাব নেই।

—আরে আমার মা’র পুষ্যিপুত্তুর রে !

বিরক্ত হয়ে অবশেষে জমিদার বললেন, যাকৃগে আর ঘ্যান ঘ্যান করিসনি। পাঁচটা টাকা না হয় তুই বেশীই নিস্—যা এবার।

এবার আত্মসম্মানে রীতিমত ঘা লাগলো ছিদামের।

অন্তরের উষ্মাকে চেপে যথাসম্ভব কোমল কণ্ঠে সে বললে, ট্যাকা আমি বেশী চাইনে, হুজুর, ও লোভ দেখাবেন না। বরং যদি বলেন ত খাজনা আমি আরো কিছু বাড়িয়ে দিতে রাজি আছি। তবু ও জমিটা—

ছিদাম তার কথা শেষ করবার সুযোগ পায়নি ঃ জমিদারের সুপুষ্ট পা'টা তখন তার বুকের ওপর এসে পড়েছে।

খুব একটা হৈ চৈ পড়লো। দ্বারোয়ান ও দাসদাসীরা ছুটে এল, উচ্চকিত হয়ে উঠলো মোসাহেবের দল। ছোটোলোকের এহেন স্পর্ধায় বিস্মিত জমিদারের কণ্ঠস্বর তখন সপ্তমে খাবি খাচ্ছে।

…ছিদামের জ্ঞান হলে সে দেখলো জমিদার বাড়ীর ফটকে পড়ে আছে। সন্ধ্যার আগে নায়েব মশাই এসে তার বাড়িতে জানান দিয়ে গেল যে আগামী পনের দিনের মধ্যে যদি সে ওই জমি আর বাস্তু পরিত্যাগ করে না যায় তাহলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থার ভার জমিদার নিজের হাতেই গ্রহণ করবেন।

নীলুখুড়োর মুখে এ কাহিনী শুনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে রইলো বলাই। লক্ষ্মণ দাশের মুখেও রা নেই।

সত্যি, শুধু চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কীইবা করতে পারে ওরা ?

ক্রমে আড্ডায় আরো অনেকে এসে জুটলো। কিন্তু আসর সেদিন আর জমলো না, দাবার ছক তোলাই থাকলো শিকেয়। সবারই মুখে ঐ এক কথা।

লক্ষ্মণ দাশ তাঁতী। জাত ব্যবসাই তার বংশানুক্রমিক পেশা। কৃষকের কাছে যেমন তার আবাদী জমি, তাঁতীর কাছেও তেমনি তার তাঁত। জড় হলেও ওরই সাথে একটা সশরীরী স্নেহের সম্বন্ধ ওরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে। তাই ছিদামের ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী আঘাত লেগেছে লক্ষ্মণের, উত্তেজিতও হয়েছে সেই সব চেয়ে বেশী।

রামকান্তর কথার উত্তরে সে বললে, তুমি বুঝ্‌বেনা কান্ত যে জাত-ব্যবসা ছাড়া আর জাতধম্ম ছাড়া একই কথা। জাতব্যবসাই যদি ছাড়লুম তবে আর লোকের কাছে পরিচয় দেবার রইলো কী?

সত্যি রামকান্ত এ সব বোঝে না। আগে সে পোষ্টাপিসের পিওন ছিল, এখন পেন্‌সন্‌ পায় যৎকিঞ্চিৎ।

সে বললে, জাতব্যবসা ছাড়তে কে বলচে লখাই? জমিদার তো সে কথা বলেননি। তাঁর জমিতেও ছিদাম চাষ করতে পারে, তবে কিনা মালিকানা আর ছিদামের রইলো না।

—যে কাজে মালিকানা নেই সেত স্রেফ চাকরের কাজ। লক্ষ্মণ বললে।

—চাষ করবে ছিদাম আর মাল গুদামজাত করবে জমিদার,—এ তোমার কোন শাস্তরে বলে কান্ত? নীল্‌খুড়ো প্রশ্ন করলো।

—কিন্তু জমি ত জমিদারের।

—মানচি। লক্ষ্মণ বললে, কিন্তু এতকাল যে খাজনা দিয়ে ছিদাম ও জমি আবাদ করে এল, তার কি কোন দামই নেই, চাষ না করলে ও জমি এ্যাদ্দিন জংগল হয়ে থাকতো। ছিদাম যা খাজনা দিয়েচে তাতে ও জমির দাম উঠে গেছে কোন্‌ কালে।

—কিন্তু উনি ত জমিদার। রামকান্ত আবার নিজেকে সমর্থন করবার চেষ্টায় গাধার মতো ঘাড় নাড়তে লাগলো।

—উনি কেন, তুমিও হতে পারতে। জমিদার হওয়ার ত আর কোন বাহাদুরী লাগেনা কান্ত, বংশে জন্মালেই হল। কিন্তু গা ঘামিয়ে যাদের বাঁচতে হয় তারাই ত মানুষ, দুঃখীর দুঃখ তারাই শুধু বোঝে। নীলুখুড়ো স্বগত বললে, কাকে কী বুঝোচ্চি! বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কী?

কথাটায় ঝাঁঝ ছিল। আহত হয়ে চুপ করলো রামকান্ত।

লক্ষণ বললে, ধরো যদি জমিদার হুকুম দেয় যে গাঁয়ের সব তাঁত জমিদারের এক্তালায় চলে যাবে, তখন আমার কী কষ্টটা লাগবে, তা তুমি বুঝতে পারো?

কানাই কর্মকার লক্ষ্মণকে সমর্থন করলো।

—ঠিক, ঠিক। আমার বেলাতেও এটা খাটে।

রামকান্ত বললে, কিন্তু জমিদার আমাদের লেখাপড়া-জানা লোক, শুনেচি বিলেতও নাকি গিছলেন। কাজেই ভেবে-চিন্তে উনি যা করচেন, তা আমাদের ভালোর জন্যেই—

নীলুখুড়ো তাকে বাধা দিল।

—আমাদের ভালোর জন্যেই! কী বলিস্ কান্ত, অ্যাঁ? কিন্তু এর কারণটা কী বলতে পারিস? দেখাতে পারিস বিনা স্বার্থে বড়লোক কোথায় গরীবের ভালোর জন্যে কিছু করেচে? তোর ঘরের চালা ভেঙে পড়লে জমিদার এসে সেই চালা বেঁধে দিয়ে যায়, না, পেটে ভাত না জুটলে জমিদার তার ভাঁড়ার খুলে দেয়রে? এই ত সেবার অমন অনাবিষ্টিটা গেল, দুটো চারাও বাঁচলো না,—কত খাজনা মকুব করেছিল জমিদার?—ওদের ভালো করার মুখে ঝাঁটা, মুখে ঝাঁটা। নীলুখুড়ো হাঁপিয়ে ওঠে।

প্রতিবাদের সুরে রামকান্ত বললে, কিন্তু ও সন্ দক্ষিণ পাড়ার জমিতে বাঁধ থেকে খাল কাটিয়ে দিলে ত জমিদার-ই। নইলে ও জমিতে কী আর ফসল হত মনে করেচ? তুত্তিন বছর তো নয়ই।

—ঠিক বলেচিস। মুখ ঘুরিয়ে নীলু খুড়ো বললে, তুত্তিন বছর ত ফসল হতই না। আর তা না হলে কী হত জানো? জমিদারেরই ভাঁড়ারে মা ভবানী অধিষ্ঠেন হতেন। চাষী না হয় গতর খাটিয়েও এক-বেলা জোটাতো, কিন্তু জমিদারের দ্বারোয়ানের মাইনে জুটতো না, গোলাপবাগের বাগানবাড়ীতে তালা ঝুলতো।

নীলু খুড়োর কথাবার্তার ধরণ দেখে বলাই ভীত হয়ে উঠছিল। কথাগুলো সত্যি হলেও অপ্রিয় বলে।

সে বললে, থাকগে খুড়ো, এ সব কথা এখন বাদ দাও। শুনিচি বাতাসেরও নাকি কান আছে—

নীলু খুড়ো হাসলো। বললে, আমার এতে কিছু এসে যাবে না, বলাই। তিনকাল গিয়ে ত এককালে ঠেকেচে, সংসারে আর কেই বা আছে, যার দিকে চেয়ে সব মুখ বুঁজে সহ্য করবো। একটু থেমে আবার বললে, কী আমার করবে জমিদার? বড়ো জোর এখেন থেকে বাস তুলবে, এই না? তা, আমার যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন।

নীলুখুড়ো থামলো। কেউ কথা কইলো না।

সে আবার বললে, জীবনে অনেক পাপ করিচি বলাই, কিন্তু বুড়ো বয়সে তার ভার আর বাড়াতে চাইনে। অন্যায়কে মুখ বুজে সহ্য করার মত অন্যায় আর কিছু নেই রে।—

নীলুখুড়োর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো। কিন্তু আত্মগ্লানিতে অবসন্ন সেই স্বরের মধ্যেও কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সুর! এইটাই তার স্বভাবধর্ম। তার বিগত জীবনের সংগে মর্মন্তুদ যে করুণ কাহিনী জড়িত আছে তার

ইতিহাস এদের সবারই জানা। হিন্দুসমাজের সেই অতি পুরাতন ক্লেদাক্ত ইতিহাস: শিক্ষিত ও জ্ঞানী বলে খ্যাতি ছিল নীলুখুড়োর, স্বাধীন ভাবে বিবেচনা করবার শক্তিও তার ছিল, কিন্তু তবুও সে সেদিন সমাজের দিকেই চেয়ে ধর্ষিতা নিরপরাধিনী স্ত্রীকে নিজের ঘরে স্থান দিতে পারেনি, মিথ্যা সংস্কারের মুখের দিকে চেয়ে সেই বর্ষার রাত্রিতেই ষোলো বছরের বালিকাকে হাত ধরে পথের মাঝে বার করে দিয়েছিল। অসহায় মেয়েটি কোন প্রতিবাদ সেদিন করেনি, চীৎকার করে কাঁদেনি, কোনো দাবিও জানায়নি, নির্বাক নয়নে শুধু একবার স্বামী-দেবতার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যায়। সে চোখে অশ্রু ছিল না, মিনতি ছিল না, ক্ষমা ছিল না, আকাশের বিদ্যুৎ ছিল কিনা কে জানে,—যুবক নির্মল জানতে পারেনি। পরদিন যখন ঘোষালদের পুকুর থেকে তার লাশ তোলা হয় তখন তার চোখ দুটো কিন্তু বীভৎস, বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু থাক, সে অতীত। তবু সে অতীত আজো মিলায়নি, রেশ টেনে চলেছে নীলুখুড়োর জীবনে।

সাম্প্রতিক আবহাওয়া করুণতরো হয়ে এলো। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো, কথার খেই সবাই হারিয়ে ফেলেছে যেন। অপ্রস্তুত রামকান্ত নিজেই নিজের একটি আঙুলকে অপরিচিতের মতো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো, আর টিকেয় আগুন ধরিয়ে অকারণ জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগলো কানাই কর্মকার। কী এক উত্তেজনায় লক্ষ্মণের শরীরের পেশীগুলো একবার বিস্ফারিত হয়ে গেল, কিন্তু চোখ মুখের অভিব্যক্তি তখন ওর ম্লান হয়ে এসেছে।

বলাই এপাশ-ওপাশ করে হঠাৎ বললে, ছিদাম যে আজ আর এলনা লক্ষ্মণ, ওর একবার খোঁজটা নেয়াও ত দরকার। বেচারা!

আন্তরিক ভাবে বললেও কথাটা কেমন যেন একটু বেসুরো শোনালো ; তবু সবাই একবার মুখ তুলে তাকালো। তারপর চোখ নামালো। সন্তর্পণে নিশ্বাস ছাড়লো।

কয়েকমাস পরে।

একযোগে তিন হাজার বিঘা জমি নিয়ে কার্পাসের চাষের সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল। এক ছিদাম ছাড়া জমি দেয়ার ব্যাপারে অবিশ্যি আপত্তি আর কেউ করেনি। কিন্তু ছিদামের কথার দামই বা কতটুকু ! বন্যার মুখে সামান্য খড়কুটোর মত তা-ত ভেসে যাবেই। এতে আফশোষ থাকলেও অভিযোগ নেই। এই নিয়ম।

চাষের প্রথমদিন যখন ট্র্যাক্টর চললো তখন পুরানো প্রায় সব চাষীই সারবন্দি দাঁড়িয়ে ছিল আলের পাশে। ছিদাম অবিশ্যি ছিলনা।

তার থাকার কথাও নয়। যে আঘাত সে পেয়েছিল তা মর্মান্তিক। নিরক্ষর, সংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ কৃষকের পক্ষে তা সহ্য করাও কঠিন।

ছিদাম ও পারেনি : পরের দিন ভোরে তার প্রিয় ক্ষেতের পাশে কালবৃদ্ধ কাকবন্ধ্যা আমগাছটার একটা ডালে তাকে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখা যায়।

জীবনে যার প্রতিরোধ করতে গিয়ে শুধু আঘাত খেয়েই ফিরে এসেছিল, জীবনমূল্যে তারই মৃদুতম প্রতিবাদও করে গেল,—এই হয়তো ছিল তার শেষ সান্ত্বনা। সে যে মা বসুন্ধরার নেমকহারাম সন্তান নয় তারই স্বাক্ষর হয়তো রেখে গেল নিজের আত্মাহুতিতে।

কিন্তু কীইবা মূল্য এই আত্মসর্বস্ব সান্ত্বনার ? কী এসে গেল তার মৃত্যুতে ? ক্ষণিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও অগ্রগামী দলের মধ্যে তা বিশৃংখলতা ঘটাতে পারেনি, প্রতিরোধ করতে পারেনি তাদের প্রগতি।

কলকাতা থেকে একজন সাহেব এঞ্জিনিয়ার ও কয়েকজন অভিজ্ঞ কর্মী এসেছে। জমিদার নিজেও উপস্থিত। আর আশে পাশের কয়েকটা গ্রাম একেবারে ক্ষেতের ধারে ভেঙে পড়েছে।

যন্ত্রচালিত ট্র্যাক্টরের ফলা যখন মাটির বুক বিদীর্ণ করে বিকট শব্দে পরিক্রমা করতে লাগলো তখন অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো জমিদারের বুক, নবতরো আশা ও আকাংখার আবেশে তাঁর শরীরের শিরা-উপশিরা কাঁপতে লাগলো থরথর করে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না, শুধু ঘন ঘন পাইপে টান দিতে লাগলেন।

সমবেত আবালবৃদ্ধবনিতার দল তখন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে, হঠাৎ-দেখা স্বপ্নের মত এই স্বপ্নাতীত ব্যাপারে তাদের দৃষ্টির প্রসার তখন দীর্ঘতরো হয়ে উঠেছে। হয়তো ওদের মনেও তরংগ জেগেছে।

অসম্ভব এতে কিছুই নেই ঃ মানুষের স্বপ্নই তো একদিন রূপ পায় বাস্তবে, স্বপ্ন তখন হয় সত্যি। ঢেউএর পর ঢেউ এসেই তো পারের সংকীর্ণতা ভেঙে তাকে দিগন্তপ্রসারী করে তোলে। তারপর এই নবীনকে কেন্দ্র করেই চলে নতুন পরিক্রমার মহড়া। এবং এই মোহও একদিন কাটে, সীমা যায় ভেঙে। পুরানো সত্যি মিথ্যে হয়ে যায়, ধ্বসে পড়ে, আর মিলিয়ে যায় নবীন সম্ভাবনার মাঝে। এই হলো ইতিহাস, চিরন্তনী এই দ্বন্দ্ব, আর এর মধ্য দিয়েই সম্ভব হয় নতুন সৃষ্টির।

আর এ হেন মুহূর্তে ছিদামকে মনে রাখা! ছিদাম ঃ সে যে একেবারে অবান্তর অবাস্তব এখানে।

ট্র্যাক্টর চললো। এঞ্জিনিয়ার সাহেব জমিদারের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

—কেমন লাগচে ?

—ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

এঞ্জিনিয়ার হাসলেন।

—জয়যাত্রা যন্ত্র-দেবতার।

—এ তো সবে শুরু, মিঃ ল্যাঙ।

ক্ষণিক স্তব্ধতা।

—তোমার প্রজারা একে কী ভাবে গ্রহণ করবে, মিঃ চাড্ডী ?

—প্রজার দিকে তাঁকিয়ে আমি চলবো না, তারাই অনুসরণ করবে আমাকে।

—এ কথার মত কথা। অভিনন্দন জানালেন মিঃ ল্যাঙ।

হেসে জমিদার ধন্যবাদ দিলেন।

—তুমি জেনো মিঃ ল্যাঙ, একটু থেমে জমিদার বলতে লাগলেন, এ শুধু আমার ক্ষণিকের খেয়াল নয়, জীবনের তপস্যা। রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু প্রস্তাবের পর প্রস্তাবই পাশ করতে পারে, কিন্তু পারে না দেশের স্বাধীনতা আনতে। স্বাধীন হতে হলে আগে তার যোগ্য হওয়া চাই। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। এর জন্যে দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হয়, স্বাবলম্বী করে তুলতে হয়।

—ঠিক কথা। মিঃ ল্যাঙ সমর্থন করলেন।

—এই হবে আমার সাধনা, যে শিল্পে ও বাণিজ্যে ভারত নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াক, তাহলেই সে পারবে বিশ্বসভায় নিজের আসন বেছে নিতে। এর জন্যে প্রয়োজন প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক আবাদী প্রথা উচ্ছেদ করে ধনতান্ত্রিক বৃহৎ স্কেলের প্রবর্তন।

মিঃ ল্যাঙ ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

—তোমার সাধনা জয়যুক্ত হ'ক, মিঃ চাড্রী। তোমার প্রোগ্রেসের দিকে আমার লক্ষ্য থাকবে। প্রার্থনা করবো যাতে তোমার স্বপ্ন বাস্তবরূপ পায়।

—ধন্যবাদ। জমিদার আবার কৃতজ্ঞতা জানালেন।

—তা হলে তোমাকে সব খুলেই বলি, মিঃ ল্যাঙ। একে পূর্ণরূপ দেয়াই শুধু আমার জীবনের একমাত্র আদর্শ নয়। এ কেবল বৃহত্তরের ভিত্তিভূমি মাত্র। নিজেই আমি কাঁচামাল উৎপন্ন করবো, কিন্তু তাকে আমি বাজারে ছাড়তে চাইনে। তুমি হয়তো আমাকে বুঝেছো! অন্তত বছর তিনেকের মধ্যেই তুমি দেখবে, যে আজ যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এইখানে হ্যাঁ, ঠিক এইখান থেকে আমার কারখানার সেই বিশাল চিমনী সোজা আকাশের দিকে উঠেচে, যন্ত্রের আবির্ভাবে এ জায়গার রূপ গেছে বদলে। ক্ষেতকে আরো দেব পিছিয়ে, এখানে ওখানে মাটির ভিৎ কাঁপবে বয়লারের গর্জনে, ফারনেসের লেলিহ শিখা শ্রমিকদের প্রাণে জাগাবে অপূর্ব উন্মাদনা, দেবে অগ্রগামীর কর্মপ্রেরণা। অসংখ্য তাঁতের চলমানতার মধ্যে প্রাণ পাবে আমার জীবনের স্বপ্ন। মানুষ হবে যন্ত্র, আর যন্ত্রই হবে মানুষ—চরম লক্ষ্য হবে সৃষ্টি। সৃষ্টি ·· সৃষ্টি···সৃষ্টি ··। শুধু সৃষ্টিই হবে আমাদের নেশা, মদ মানুষকে মাতাল করে আর আমরা মাতাল হবো সৃষ্টির নেশায়।

শেষের দিকে জমিদারের গলার স্বর একটু মাত্রা ছাড়িয়েছিল, মিঃ ল্যাঙ তাঁর হাত চেপে ধরলেন।

—বড়ো উত্তেজিত হয়ে পড়চ, মিঃ চাড্রী।

জমিদার লজ্জিত হাসি হাসলেন।

কাহিনীর যবনিকা উঠলো এবার। পাঁচ বছর পেরিয়ে।

জমিদারের জীবনের স্বপ্ন রূপ পেয়েছে।

গ্রামের প্রান্তভাগে গড়ে উঠেছে বিশাল 'রায় চৌধুরী কটন মিল'। গ্রামের সে পলাশপুর নাম আর নেই, এর নাম এখন 'রায়নগর'। কটন মিলের আকাশস্পর্শী চিমনীর অবিরাম ধূমউদ্গীরণে গ্রামের সেই সজীবতা, সেই আরণ্য ঐশ্বর্য আজ বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন। গোটা চাষীপাড়া ভেঙে ফেলা হয়েছে. তার পরিবর্তে সেখানে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার ছোটো ছোটো টিনের খুপরী। এগুলি শ্রমিকদের বস্তি। এখানে ওখানে কয়েকটা টিউবওয়েল আর একটা দাতব্য চিকিৎসালয়, চায়ের দোকান এবং শুঁড়িখানা। আমদানী হয়েছে একদল হতভাগিনীর যারা মিলে মেহনৎ বেচে না, কিন্তু বাজারে দেহ বিক্রি করে। বাসের জন্য তাদের কোন ট্যাক্স্ দিতে হয়না জমিদারকে—এটা তাঁর দয়া। শ্রমিকদের শুভানুধ্যায়ী তিনি, তাদের জীবনকে আমোদ আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করতে চান না। শ্রমিকদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন মনেপ্রাণে, তাই একটা অবৈতনিক পাঠশালা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করছেন। কিন্তু এতে অপর পক্ষের আগ্রহের অভাব দেখে এখনো কাজে হস্তক্ষেপ করেন নি। তাঁর দৃষ্টিভংগি আধুনিক। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতার দিকে তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন, শ্রমিকদের গঠিত ট্রেড ইউনিয়নকে তিনি মনে প্রাণে সমর্থন করেন; তাই তিনিই তার সভাপতি!

গ্রামের রূপ বদলেছে বইকী। গ্রাম না বলে একে এখন সহরতলী বলাই ভাল। মিলের থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত রেল লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাইরে থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর দল এসে হরেক রকম দোকান সাজিয়ে তুলেছে। একটা সস্তা সিনেমা হাউসও আছে। হিন্দি ও বাংলা দু'রকমের বই-ই দেখান হয়। কারণ রায়নগরের অধিবাসী আজ শুধু বাঙালী নয়।

আজকের মোটার ট্রাক ও লরির পাশে পুরানো গোরুর গাড়ীগুলো নিতান্তই বেমানান।

শ্রমিকদের মধ্যে খোঁজ করলে গ্রামের অনেক চাষীকেই পাওয়া যাবে, শুধু চাষী নয়, কুটীর-শিল্প-জীবিদেরও। কিন্তু তাদের আর চাষী বলেনা, বলে মজুর। তাদের সেই আকৃতিও নেই, প্রকৃতিরও হয়েছে পরিবর্তন। ইস্পাতের সংগে কাজ করে করে তারাও আজ সচল ইস্পাত। পৈত্রিকতার ধার তারা ধারে না, ক্ষেতভরা সোনার ফসলের দিকে তাকিয়ে তাদের চোখে গড়ে ওঠে না কোনো স্বপ্ন, কোনো অতীন্দ্রিয় মোহ দেয় না অশরীরি হাতছানি। বাস্তু-লক্ষ্মীর মূঢ় সংস্কারের মোহে আজ আর কেউ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে না।

চরম মূর্খতা সেটা!

ছিদামের অপমৃত্যুতে এদের মধ্যে যাদের প্রাণ একদিন কেঁদে উঠেছিল, তাদের ঠোঁটের কোণেও সে কথার স্মরণে আজ খেলে যায় বাঁকা হাসি।

ঈশ্বরের আশায় আজ আর ধন্না দিয়ে বসে থাকে না, সে ভুল ওদের ভেঙেছে; ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। ওরা জেনেছে এই জীবনই সব, সত্য একমাত্র পারিপার্শ্বিক, আর শাশ্বত ওই মিল ও বস্তি, শুঁড়িখানা এবং বারবণিতার দামী সাহচর্য। জীবনের গতি হয়ে এসেছে ছন্দহীন সরল, কিন্তু পাকে পাকে অন্তরের গ্রন্থি হচ্ছে জটিলতরো—বিপর্যস্ত জৈবিক সংঘাতে। অশিক্ষিত মন সে খোঁজ রাখে না, আত্মরোমন্থনের বিষফল ঝাপসা চোখ সে দৃষ্টিভংগি হারিয়েছে।

তাই মাঝে মাঝে যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, অন্তরের আদিমতা যখন মাথা চাড়া দেয়, তখন মন্দিরের দ্বারে ওরা মাথা খোঁড়ে না, বা গলায় দড়ি দিয়ে স্বর্গে পোঁছায় না—মিলে রাত-ভোর ওভার টাইম খাটে কিম্বা মদ গেলে মাত্রাতিরিক্ত।

সবই বিধাতার, অর্থাৎ, বিধানদাতার ইচ্ছা সাপেক্ষ!

বলাই-এর দোকানের আড্ডা ভেঙেছে। তারো রূপ গেছে বদলে। এই পাঁচ বছরের ব্যবধানে বলাই-এর সিন্দুক ভারী হয়েছে রীতিমত আর দোকানটি স্থানচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে একটি একতালা কোঠাবাড়িতে। দু'জন কর্মচারী দোকান চালায়। বলাই বসে বসে তামাক খায়, তদারক করে আর রামায়ণ পড়ে সুর ক'রে।

শীতের মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়িয়েছে। হেঁট হয়ে বলাই অরণ্যকাণ্ডের পাতা ওল্টাচ্ছে ঘনঘন। দোকানেও তেমন ভীড় নেই। এমন সময় এলো লক্ষ্মণ।

—আরে এস এস, ওরে তামাক দে, তামাক দে। তারপর, দু'দিন যে পাত্তাই নেই? ব্যাপার কী? নিজের তাকিয়া সরিয়ে দিয়ে লক্ষ্মণকে অভ্যর্থনা করলো বলাই।

কোন উত্তর দিল না লক্ষ্মণ। অর্থহীন হাসলো শুধু।

তার দিকে তাকিয়ে বলাই বললে, বড় যে মনমরা দেখাচ্ছে, কিছু হয়েছে নাকি?

—না, হবে আর কী? তবে সাংসারিক—

—আরে, রেখে দাও তোমার সাংসারিক। রামায়ণটা কপালে ছুঁইয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলো বলাই।—ও ভাবলেই মাথা খারাপ, নইলেই নিশ্চিন্দি।

হ্যাঁ, বলাই আজ একথা বলতে পারে। লক্ষ্মণ ভাবলো।

—তার চেয়ে পরকালের চিন্তা দেখ, কাজ হবে।

—তাই দেখচি।

তার গলার স্বর শুনে বিস্মিত হয়ে বলাই তাকালো তার দিকে, কিন্তু লক্ষ্মণ তখন হুঁকোর আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। হুঁকোয় অকারণ ঘনঘন টানে বলাই-এর মুখের প্রশ্ন মুখেই রয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে কুলুংগির সিদ্ধিদাতার দিকে তাকিয়ে হাঁ করে কয়েকটা তুড়ি দিয়ে বলাই বললে, হরি হে পার করো।

তারপর কয়েক মুহূর্ত কাটলো এমনি কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মধ্যে।

—বলাই। এক সময় মৃদুকণ্ঠে ডাকলে লক্ষ্মণ।

—কিছু বলবে আমায়?

—না, বলবার কিছু নেই। একটু থেমে লক্ষ্মণ বললে, তোমার ছেলে কদ্দিন মারা গেছে বলতে পারো বলাই।

এ সময় লক্ষ্মণের এ রকম প্রশ্নে বলাই বিস্মিত হলো। ছেলে তার ছিল, এবং সেই তার একমাত্র পুত্রসন্তান। কিন্তু সে মারাও তো গেছে অনেক দিন; পুরানো সেই দুঃখের স্মৃতি আজ আর জাগিয়ে লাভ কী? সে ইতিহাস কী অজানা লক্ষ্মণের?

—আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন লক্ষ্মণ? বলাই জিজ্ঞাসা করলো।

—হঠাৎ-ই মনে এল, কণ্ঠে যেন রহস্য এনে বললে লক্ষ্মণ, আজ হঠাৎ-ই এ কথা বারবার মনে হচ্ছে,—হিংসে হচ্ছে তোমার সৌভাগ্যে।

—সৌভাগ্য! আমার সৌভাগ্য! বলাই আঁৎকে উঠলো, তুমি কী বলচো লক্ষ্মণ?

—ঠিকই বলচি। ছেলে নেই বলেই আজ সবাই তোমার দিকে চায়, আজও তাই তুমি বলাই-ই আছো। সে বেঁচে থাকলে সে-ই হত সব, কেউ ফিরেও চাইতো না তোমার দিকে। তোমার ছেলেও নয়।

—আমার ছেলেও আমার দিকে ফিরে চাইতো না, লক্ষ্মণ?

বলাই-এর স্বরে গভীর বিস্ময় ঝরে পড়লো।—ছেলে না থাকার

যে কী দুঃখু তা তুমি বুঝবে না লক্ষ্মণ, তুমি তা বুঝবে না।

একটু থেমে, অন্যদিকে তাকিয়ে বলাই বললে—এক একবার ভাবি, এই যে এত উপায় করি; আমি মলে কী হবে এসব, এ কী আমার সংগে যাবে? দু'টো মেয়ে ছিল, তা'ত অনেক দিনই পার করেচি। কার জন্যে এত সব? মনে মনে ভাবি, বুঝিও, কিন্তু ছাড়তে পারি নে—ট্যাকার নেশা আমার ভেতরে শেকড় নামিয়েচে। আজ যদি ছিষ্টিধর বেঁচে থাকতো তা'লে তার হাতে দোকান তুলে দিয়ে নির্ঝংঝাটে কাশীবাস করতে পারতুম। শেষের দিকে দিকে বলাই-এর গলা ধরে যায়।

—তুমি ভুল করচো বলাই।

—ভুল!

—হ্যাঁ, ভুল করচো তুমি।

বলাই বললে, আমায় তুমি জানো লক্ষ্মণ, ষোলো বছর বয়েসে এই দোকানে ঢুকেছিলাম, বুড়ো বাপের হাত থেকে সংসারের ভার নিয়ে। আমার বাবাও—

—অবিনেশ কাকাও তাই করেছিলেন, তা আমি জানি বলাই। কিন্তু এটা কলিকাল।

—হবে। কিন্তু ছিষ্টিধর আমারই ছেলে, আমারই বাপপিতাম'র রক্ত তার শরীরে ছিল। সে কথনো—

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো লক্ষ্মণ।

—রক্তের সম্বন্ধ কলিতে বড় নয় বলাই, বড় হল ট্যাকা। এই ধরো আমার ছেলে বিষ্টুপদ, তাকেও আমি বুকে করে মানুষ করেছিলুম, আমারও বাপপিতাম'র রক্ত ছিল তার শরীরে। কিন্তু—

বাধা দিয়ে বলাই বললে, সে কী আজকাল তোমার সাথে এমনি

ব্যাভার-ই করচে লক্ষ্মণ ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে লক্ষ্মণ বলতে লাগলো, প্রথম যেদিন সে মিলে ঢোকে, কত মানাই ওকে আমি করেছিলুম, যাসনি বিষ্টু,—নিজের জাতব্যবসাকে হেনেস্তা করিসনি। ঘরের লক্ষ্মী তাঁতকে অপমান করিসনি। কিন্তু ও তা শুনলে না, পাঁচ ট্যাকা হপ্তাই ওর কাছে বড় হল। ঘরের লক্ষ্মীতে মন ধরল না, রাক্কুসী কারখানাই হল সব। কেঁদে কেঁদে ওর মা চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল।

—তা মন্দ কী ? ও তো উপায় করচে।

—উপায় করচে ! কিন্তু, বেল পাকলে কাকের কী বল ? এ্যাদ্দিন থাকতো আমার সংগে, সংসারে খরচ পত্তরও দিত। কিন্তু বিধেতা বাদ সাধলেন। ঘাড়ে ওর ভুত চাপলো। অনেক সহ্য করেছিলুম বলাই,—

লক্ষ্মণের চোখ দিয়ে এবার জল গড়িয়ে পড়লো।

—কিন্তু যেদিন বাইশ বছরের ছেলে বিষ্টুপদ, যাকে আমি বুকে করে মানুষ করেছিলুম, সেই আমার বিষ্টু, নেশা করে বাড়ি ফিরলো সেদিন আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো। এই আমার ছেলে ! যে কোনদিন আমার সামনে তামাকও খায়নি, আমার মুখের ওপর কোনদিন একটা কথাও কইতে সাহস করেনি, সে-ই কিনা সেদিন আমারই চোখের ওপর বৌমার গায়ে হাত তুললো !

বলাই বললে, বিষ্টু এতদূর অধঃপাতে গেচে ! নেশা করে, বৌমার গায়ে হাত তোলে,—একথা তো তুমি এ্যাদ্দিন বলোনি, লক্ষ্মণ ?

—ছেলে মদ খায়, বাপ-মা কী একথা মুখ তুলে বলে বেড়াতে পারে, বলাই ? হাজার হলেও আমি ওর বাপ, আমার রক্তে ওর জন্ম, আমার বুকেই ও মানুষ, ওর ব্যারামের সময় আমিই ওর জন্তে মা শেতলার কাছে মাথা কুটি।

—মদ অবিশ্যি আজকাল অনেকেই খায়, বলাই বললে, মদ না খেলে নাকি ওরা বাঁচতে পারে না। একটু থেমে বলাই বললে।

—আর মদ খেয়েও কী চমৎকার বেঁচে আছে আমার বিষ্টুপদ! লক্ষ্মণের স্বরে শ্লেষ ঝরে পড়লো।—ওকথা আমায় আর কয়োনা বলাই। যেদিন আমার লক্ষ্মীর মত বৌমার গায়ে ও হাত তুললো, সেদিন আর থাকতে পারলুম না আমি,—দিলুম দু'কথা শুনিয়ে। সহ্যেরও একটা সীমে আছে!' ছেলের আমার রাগ হল তাতে, গট্‌গট্ করে বার হয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। শুনি, এখন নাকি কাকে নিয়ে বস্তিতেই একটা ঘর ভাড়া করেছে। ঘরমুখোও আর হয় না।

লক্ষ্মণ থামলো। ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। বলাই-এর মুখে কথা নেই, কী উত্তর দেবে সে এর? কী করবে এর বিশ্লেষণ? সান্ত্বনা দেবারই বা আছে কী! দুঃখ দুর্দশা সংসারে নিত্য-নৈমিত্যিক, অভাব-অভিযোগের প্রাচুর্য চারদিকে, তবু এরি মাঝে লক্ষ্মণের যে বেদনা তা অপরিসীম, সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব এই অবসর-মন্থর গ্রাম্য পরিবেশে।

ওদের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে সত্যি, তবু তা প্রতিফলিত অতীতের পটভূমিকায়। বর্তমানের সংঘাতে মাঝে মাঝে ওরা বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে ঠিক, কিন্তু বর্তমান এমন রূঢ়বাস্তব মূর্তিতে ওদের মুখোমুখী হয় ক্বচিৎ।

জীবনের প্রান্তসীমায় এসে ওদের মুমূর্ষু চোখের সামনে আজই হয়ত প্রথম ঝড়ের ইসারা এলো, স্পন্দনের ঢেউ জাগলো!

লক্ষ্মণ বললে, দুঃখের কথা আর কী বলবো, বলাই! গত আড়াই মাস তাঁত একেবারে বন্ধ। কে কিনবে আমার কাপড়? ওর চেয়ে চটকদার কাপড় আজ সস্তায় মিল দিচ্ছে, গেঁয়ো তাঁতের ঝল্‌ঝলে কাপড়ে লোকের মন উঠবে কেন? অথচ আজো গাঁয়ের অনেকের

প্যাটরা খুললে এই লখাই দাশের বোনা কাপড় মিলবে। বড় মেয়ের বিয়ের সময় রায়বাড়ির বড় কর্তা কাপড় দেখে খুশি হয়ে আমায় পাঁচট্যাকা বকশিস দিয়েছিলেন, সেকথা আমি আজো ভুলিনি। আর এখন একটা গামছা নিয়ে গেলেও ফেরৎ আনতে হয়, এমনিই বরাত! তার বুক থেকে একটা নিশ্বাস বার হয়ে আসে।

—যাকগে, তাকে সান্ত্বনা দিল বলাই, যাকগে, ও ভেবে আর কী করবে, লক্ষণ। কলির ধর্ম্মোই এই। সস্তায় কে না চায় বল?

—নিশ্চয়ই! কে না চায় সস্তায়! ট্যাকাই যখন সব। লক্ষ্মণ হেসে উঠ্‌লো।

বলাই তা বুঝলে না। বললে, সবই বুঝি, কিন্তু কী করবার আছে। চেষ্টা চরিত্তির করে দেখনা যদি মিলে একটা—

—মিলে! মিলে চাকরী করবো আমি? যেন জ্বলে উঠলো লক্ষ্মণ, ঘরের তাঁত ছেড়ে ছুটো পেটের ভাতের তরে পরের দোরে ধন্নে দেব। ছুদিন বাদে যখন কুকুরের মত খেদিয়ে দেবে, তখন আবার ঘুরবো ফ্যা ফ্যা করে? খাটবো পরের মিলে, তৈরী করবো পরের মাল। কেন? না পেটের জন্যে! পেটটাই বড় হবে, আর জাত ব্যবসা ছেড়ে এই গোলামিটা কিছুই নয়? ছিদামকে মনে পড়ে বলাই? ও যা করতে পেরেছিল তা কী খুবই শক্ত?

বলাই চমকে উঠলো, সেকী লক্ষণ? তুমি—

—পাগল! বিষণ্ণ হাসি হাসলো লক্ষ্মণ, ওতেও সাহসের দরকার।

সংসারের অভাব এরপর যেভাবে বেড়ে চললো তা সত্যিই মর্মান্তিক। তাঁত বন্ধ, এবং ঐ ছিল জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। অভিযোগ ওর ভিত্তিহীন নয়—সস্তায় মিলের কাপড় পেলে কেইবা কিনবে

তাঁতের কাপড় ?

পুরানো পুঁজি ভাঙিয়ে চললো কিছুদিন, এবং তাও কোনমতে। কিন্তু অবশেষে এও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। দুবেলা হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

বিষ্টুপদর পরিত্যক্ত দেড় বছরের ছোট বাচ্চাটা দুগ্ধাভাবে চিঁ চিঁ করে, তার মা শুকনো মাই মুখে দিয়ে বসে থাকে। অবোধ শিশু দুধ টানে, পায়না। কেবল মুখ ঘসে আর কাঁদে। বিরক্তিতে মা'র মুখ থেকে অভিশাপ বার হয়ঃ অভাগিনীর চোখে নিদারুণ অসহায়তার অশ্রু তখন টলটল করছে।

ওদিকে একেবারে মূক হয়ে গেছে লক্ষ্মণের স্ত্রী। তার এতকালের নিস্তরংগ জীবন আজ সহসা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রতি আজ তার আর অভিযোগের যেন অবধি নেই। ও বুঝেছে, দেবতার দ্বারেও মাথা কোটা চলেনা, কারণ তিনি প্রভু—ঘুষ নইলে তাঁরো মন ওঠেনা। স্বর্গের দেবতা তিনি, মর্তের সংগে তাঁর ব্যবধানের ব্যাপ্তি অনেকখানি। ওপর থেকে শুধু আঘাতই নামে, নিচের অভিযোগ সেখানে পৌছায় না!

যাহক, লক্ষ্মণকে দেখে বিস্ময় জাগে বইকী। সংঘাত যত বাড়ে তত অটল হয়ে বসে থাকে সে। অভাবের তাড়নায় উন্মাদ হয়ে উঠলেও ছিদামের ধারা অনুসরণ করে না। পরিবর্তে কয়েকজন কাবুলিওলার সংগে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। তবু বর্তমানে তো বাঁচুক।

সন্ধ্যার দিকে কোত্থেকে ঘুরে এল লক্ষ্মণ। বাড়ী ঢুকতেই তার স্ত্রী বললে, ওগো শুনছো।

—কী? ঝাঁঝালো কণ্ঠে উত্তর দিল লক্ষ্মণ।

—ছেলেটার দিকে যে আর তাকান যায় না। নিজেরা না হয় উপোস করি, কিন্তু চোখের সামনে কী ওই কচিটা না খেয়ে মরবে? হাজার হলেও ওত আমারি বিষ্টুর ছেলে। লক্ষ্মণের স্ত্রী কেঁদে ফেললো।

ধমক দিয়ে উঠলো লক্ষ্মণ, ও যাতা নাম আমার কাছে আর কখ্খনো করিস নে বউ,—এই আমি বারণ করে দিলুম। বুঝবো আমার ছেলে মরে গেচে, কিম্বা ছেলেই হয় নি আমার।

—ওগো ওকথা বলতে নেই।

—কী বলতে আছে, আর কী বলতে নেই, তা তোর থেকে আমি ভাল বুঝি, বুঝলি? ছেলে! ছেলে! ছেলে! এ যেন ইষ্টনাম হয়ে দাঁড়িয়েচে। কিন্তু সে হতভাগা একবারো ফিরে তাকায় কারো দিকে? নিজে তো মদ বেশ্যা নিয়ে ফুর্তি মারচে, একবারো ভাবে তার গর্ভধারিণীর কথা? কদিন পেট ভরে খাসনি বলত, বউ? ওর স্বর বিকৃত হয়ে এলো।

লক্ষ্মণের স্ত্রী কাঁদতে লাগলো। শব্দ করে নয়, একান্ত নিঃশব্দে। তার আনত চোখ থেকে ফোঁটার পর ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো মাটিতে।

—এই যে পরের মেয়েকে এনে এমন করে ভাসিয়ে দিয়ে গেল, ফিরে চাইলে একবার? একবারো ভাবলে ওই নির্দ্দোষ দুধের বাচ্চাটার কথা? মিছে আমরাই কেবল ওর জন্যে ভেবে মরি, পাগল হই। লক্ষ্মণ মুখ ঘুরিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। স্থাণুর মত তার স্ত্রী দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা তীব্র আর্তনাদ উঠলো। কণ্ঠটা পুত্রবধুর। ঘর থেকে ছুটে বার হয়ে এল লক্ষ্মণ।

—ওকী হল? দেখত, দেখত বউ।

তার স্ত্রী ততক্ষণে পুত্রবধুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে। পেছনে পেছনে হন্তদন্ত হয়ে লক্ষ্মণও ছুটে এল। দেখা গেল ঘরের মধ্যে বৌমা তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কোলের ওপর থেকে ছেলের মাথা এলিয়ে পড়েছে। চোখ তার বোঁজা, বেশ বোঝা যায় জ্ঞানও নেই।

দেখেই লক্ষ্মণের স্ত্রী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো, এ কী সব্বনাশ হল, বৌমা! দু'হাতে সে ছেলের মাথা ধরে নাড়া দিতে লাগলো।—দাদু দাদু, দিদারে। ওগো জল আন শীগ্‌গীর।

—গলা শুকিয়ে বাছা আমার—শ্বশুরের সামনেও বৌমা নিজেকে সামলাতে পারলো না।

লক্ষ্মণের সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখা অসম্ভব।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে ছুটে সে ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

উপায়! উপায়! হ্যাঁ, এর থেকে উপায় তাকে একটা বার করতেই হবে। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে অন্তত শেষবারের মত একবার প্রাণান্ত চেষ্টা তাকে করতেই হবে। নিজের বংশকে সে এমন করে নিশ্চিহ্ন হতে দেবে না। কখনো না।

অনেক দিনের কেনা একটা রঙিন তাঁতের শাড়ি পাট করে তোলা ছিল। তার বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটি দিনের সংগে এর একটি চমৎকার ঐতিহাসিক সংযোগ রয়েছে,—তাই এটা বিক্রি করবার কথা তার কোনদিনই মনে হয়নি। এর প্রতি বুননে যেন মেশানো রয়েছে অশরীরি আত্মীয়তার পরশ। এত দিনের এত অভাবের মাঝেও এটার দিকে সে কখনো লুব্ধ দৃষ্টি দেয়নি।

আজ সেটাই সে বার করে নিল।

জমিদারের হাতে পায়ে ধরলেও কী তিনি এ উপকারটুকু করবেন না?

শাড়িটা বুকে করে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

দুঃসংবাদের যে পাখা আছে রাস্তায় পা দিয়েই তার পরিচয় পেল লক্ষ্মণ। কতক্ষণ আগেই বা ঘটেছে কিন্তু এরি মধ্যে সেটা সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। কথাটা শুনে চমকানো স্বাভাবিক, কিন্তু আজ সে স্বাভাবিকতারও বাইরে। নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সব শুনলো।

বিষ্টুপদ, হ্যাঁ, তারি ছেলে বিষ্টুপদ, একটু আগেই নিজের সামান্য ভুলের জন্যে একেবারে মেসিনের তলায়—

এ-ই-ই? কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে, আর কীইবা আছে দুঃখের? লক্ষ্মণ ভেবে পায় না। এত আজ নতুন নয়—পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রায়ই তো হয়।

একেবারে শেষ!

শুনে একটুও কাঁপলো না লক্ষ্মণ। অপরের প্রবোধবাণীর মৃদুতম ভগ্নাংশও তার কানে প্রবেশ করলো না। তাকে একটুও উত্তেজিত মনে হচ্ছে না কিন্তু।

তার ছেলে বিষ্টুপদ আর নেই? একেবারে মেসিনের তলায়!

কি আশ্চর্য! এ সংবাদে একটুও কান্না পাচ্ছে না তার। যাকে সে বুকে করে একটু একটু করে মানুষ করে তুলেছিল, তার রক্তে যার জন্ম, তার সেই একমাত্র সন্তানের জন্যে লক্ষ্মণের বুক আজ একেবারো হাহাকার করে উঠছে না কেন? কি আশ্চর্য!

লক্ষ্মণের বুক থেকে একটা অদম্য কাশির বেগ ঠেলে ওপরের দিকে ওঠবার চেষ্টা করে। কোন মতে সে সেটা চেপে রেখে জমিদারের বাড়ির দিকে দ্রুত এগুতে লাগলো।

হঠাৎ কি ভেবে পথের পাশে একটা ঝোঁপের মধ্যে কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তারপর বুক ফুলিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

মৃত বিষ্টুপদর শূন্যস্থানে তার দাবিই যে সর্বাধিক!

ভূমিকা

(ফুলদি-কে)

ফাল্গুন
১৩৪৭

বত্রিশ টাকায় সংসার না চললে সে দোষ কী মুরারির ? বারবার ঐ একই প্রশ্ন মুরারি করে রাধাকে।

কিন্তু সে জাতের মেয়েই নয় রাধা। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, 'তার আমি কী জানি ? আমি কী তালে চুরি করবো ?'

'না, চুরি আর তুমি করবে কেন।' রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে থাকে মুরারি, 'পুরুষ মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, তখনত অনায়াসেই ডাকাতি করতে পারি'—

এমনি করেই রোজ শুরু হয়, তারপর শেষ হয় তুমুল ঝগড়ায়। দীর্ঘ চার বছর ধরে চলেছে এই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি।

অন্য ভাড়াটেরা হাসে, বিস্মিত হয়, রগড় দেখে। 'ভগবান দুটিকে জুটিয়েছেন ভালো—যেমন দ্যাবা তেম্নি দেবী,' মন্তব্যে ধন্যবাদও হয়তো জানায় সেই সর্বশক্তিমানকে।

সবকিছুরই পৌনপুনিকতায় ক্লান্তি আসে, কিন্তু মুরারি-রাধা-কাহিনী যেন তারো ব্যতিক্রম। রোজ একটা-না-একটা আব্দার রাধা করবেই আর টাকার ছুতোয় মুরারি সেটা এড়িয়ে যাবেই—দুজনে যেন আদা-ছোলা খেয়ে শপথ করেছে।

'আমি কিছু বললেই তুমি কেবল হাঁ-হাঁ করে ওঠো। কিন্তু কী দিয়েচো বলোত' এ-চার বছরে ? না একটা ভালো শাড়ি, না একটা গয়না—এককৌটা ছোনোও না।' ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে থাকে রাধা, 'আর ওদের পাঁচির,—তিন-তিনটে বিইয়ে গেলো'—

'কিন্তু কী করবো বলো ?' সমান স্বরেই উত্তর দেয় মুরারি, 'বত্রিশ টাকায় খেতেই কুলোয় না তার আবার শখ'—

'শখ !' গরম তেলে যেন জলের ফোঁটা পড়লো, 'শখটাই তুমি শুধু দেখো, না ? আমারও কী সাজতে গুজতে একটুও ইচ্ছে যায় না ?

কী এমন বয়েস শুনি ?'

'বয়েস আর কী ! এইতো ভরা ভাদর ।' অস্ফুট স্বরে মুরারি বলে ।

'বটেই তো ।' জ্বলে ওঠে রাধা, 'তোমার মতনত আর পোড়াকাঠ নইগো !' স্বাস্থের দিক থেকে মুরারিকে পোড়াকাঠ না-বলা গেলেও তুলনায় রাধা সত্যি সুন্দরী ।

ভাতের থালা টান মেরে উঠে পড়ে মুরারি ।

'অতোই যদি সাজগোজের শখ তবে যাওনা সেখেনে । বয়েসটাও কাজে লাগবে ।'

'কা ! কী বললে ?' বোমার মতন ফেটে পড়লো রাধা । নাকের জলের হু-হু বর্ষণ, চোখে বিদ্যুৎ আর কণ্ঠে মেঘের গর্জন—রাধার রূপ বদলে গেলো মুহূর্তে ।

ওদিকে এঁটো হাতেই রাস্তায় নেমে পড়েছে মুরারি ।

সন্ধেবেলায় হয়তো ওটা চাপা পড়ে গেলো । কিন্তু তার জের চললো অন্যদিকে ।

কোনোকোনোদিন রাত্রিও বাদ যায়না । পাশাপাশি দুজনে শুয়ে তক্তপোষের ওপর ।

'কাল একটা টাকা বেশী দিওতোগো ।' মিনতি করে রাধা বললে ।

'কেন শুনি ?'

'দরকার আছে ।' গলায় খানিকটা আব্দারের খাদ মেশালো রাধা ।

'দরকারটাই জানতে পাইনে ?' তার কথার উষ্ণতা ধরা পড়লো না রাধার কাছে ।

কানের কাছে মুখ এনে কিছুক্ষণ রাধা ফিস্‌ফিস্‌ করলো।

'যত্তো সব বাজে ইয়ে তোমার।' বিরক্তি ভিড় করে এলো মুরারির কণ্ঠে।

'না না লক্ষ্মিটী, দিও কিন্তু।' মুরারির থুতনি ধরে নাড়া দিলো রাধা, 'আমি কথা দিয়েচি।'

'বেশ করেচো। আর কিছু দিতে হবে না।'

'তা হয় না।'

'হতেই হবে।' স্বরে অস্বাভাবিক রকম জোর দিলো মুরারি, 'একটি আধলাও আমি দেবোনা। পরেশের বৌয়ের ছেলেপিলে হবে তা তোমার কী?'

'না, সাধ আমি দেবোই।' রাধাও যেন কোমর বেঁধে লাগলো, 'আমার নাকছবি বিক্রি করেও দেবো, দেখি তুমি কী করতে পারো!'

'তাই যদি দেবে, তা'লে আঁর আমার কানের কাছে টক্‌খাই-টক্‌খাই করা কেন?' পাশ ফিরে শুলো মুরারি, 'আচ্ছা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েচিরে বাবা, খালি দাও আর দাও—যেন গোটা বম্ভাণ্ডটা দিলেও গিলে ফেলে। ঘেন্না ধরিয়ে দিলে যাহোক!'

মুরারির স্বগতোক্তি স্পষ্ট শুনতে পেলো রাধা। এখন রাত্রি। জোর চীৎকার হলে অন্য ভাড়াটেদের ঘুম-ভাঙার সম্ভাবনা, তাই অনুচ্চ যে-আলোড়নটা হলো তাদের মধ্যে—বাইরে তার বিন্দুবিসর্গও এলো না। সেই আবছা আলোয় ওদের ঘর্মাক্ত ক্লান্ত দেহের দিকে তাকিয়ে সহসা কোনো তৃতীয় পক্ষ মনে করতে পারতো, যেন রতিক্লান্ত একটি সুখী দম্পতি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুজনের পাশ বালিস দুটো তখন পরস্পরের মাঝে স্থানলাভ করছে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধ আক্রোশে ফোঁস-ফোঁস করছে রাধা, আর তক্তপোষের এ-কিনারে পড়ো-পাড়ো অবস্থায় কাৎ

হয়ে গোঁ-গোঁ করছে মুরারি।

উভয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে হলে ওদের দীর্ঘ চার বছরের বিবাহিত জীবনের রোজনামচার ইতিহাস বলতে হয়।

প্রেসটা বড়োই, তবে লোক সবশুদ্ধ এগারোজন—মায় মানেজারো। বারো হলেই আবার ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের ধাক্কা সামলাতে প্রাণ যাবে, প্রোপ্রাইটার তা জানে, আর কম্পোজিটর মুরারিও তা বেশ বোঝে। কারণ মাত্র পাঁচজন কম্পোজিটর দিয়ে অতবড়ো প্রেসটা চালাতে গিয়ে প্রোপ্রাইটারের প্রাপ্য ধকলটা তার ওপর দিয়েই যায়।

নতুন মাসের কয়েকদিন হয়ে গেলো। আজ হয়তো মাইনেটা পাওয়া যেতে পারে, মনে মনে বত্রিশ টাকার খরচের এক খসড়া করতে লাগলো মুরারি—হাত তার টুকটুক করে যান্ত্রিক অভিব্যক্তিতে টাইপ তুলেই চলেছে। ওধারে বসে কাজ করছে ভবভূতি।

'দাওতো ভাই দেশ্লাইটে একবার।' ভবভূতি বললে, কিন্তু মুরারি শুনতে পেলো না।

'কিহে, ভাবচো কী এত ?'

'আমায় বলচো ?' মুখ তুলে মুরারি চাইলো।

'না দেয়ালকে ! বলি, এত উড়ু-উড়ু মন কেন ? পরিবারের চিন্তায় বুঝি ?'

'কী যে বলো ?' সলজ্জ হাসলো মুরারি 'আর বুঝি অন্য কিছু থাকতে নেই ?'

'উঁহু, বিয়ে-আলা মানুষের থাকতে নে-ইত।' চোখেমুখে কপট গাম্ভীর্য আনলো ভবভূতি।

'তাই নাকি ? তা তুমিত ও-রসে বঞ্চিত। জানলে কী করে ?'

'আরে, বিয়ে করিনি বলে কী শালার বরযাত্রীও যাইনি।' অভিজ্ঞের হাসি হাসলো ভবভূতি, 'দাও ভাই দেশলাইটে। এই শালার বিড়িও তিন পয়সা বাণ্ডিল, দেশলাইও তিন পয়সা পাকিট। ঢাকের দায়ে মনসা বিকোয়। ভ্যালা যুদ্ধ রে বাবা।'

দেশলাই বার করে দিলো মুরারি। ওপাশে ভবভূতি যেন যুদ্ধের সংগেই যুদ্ধ বাধিয়ে তুলেছে—অবিশ্যি গলাবাজিতে।

ম্যানেজার বাবু এলেন। 'কিহে মুরারি, হলো তোমার তিন নম্বর গেলিটা? ওকী, এখনো যে হাতই নাড়ছো? আরেঃ, চটপট বেঁধে একটা প্রুফ্ টেনে দাও শীগগীর, খদ্দের বসে থাকবে কতক্ষণ?'

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো মুরারি। 'আজ্ঞে, বর্জেসে এই ফুটনোটটা জুড়ে দিলেই হয়।'

'নাও নাও, শীগগীর নাও'। ম্যানেজার বাবু তাড়া দিলেন, 'আজই তোমাদের পেমেণ্ট্টা করিয়ে দেবো।' কচ্ছপের গতিতে তিনি তাঁর বিরাট বপুসহ নিষ্ক্রান্ত হলেন।

'কী বলে গেলো হে?' কাণ খাড়া করে উঠলো ভবভূতি।

'পেমেণ্ট হবে আজ, খপর দিয়ে গেলো।'

'তাই নাকি'! লাফিয়ে উঠলো ভবভূতি, 'যাক, শালার রাতটা আজ কাটবে ভালো। কাল আবার রোববার, শালার সোনায় সোহাগা।' ভবভূতির চোখ দুটো আনন্দে চক চক করতে লাগলো।

'কী যা তা বলচো?'

'ও তোমার শুনে কাজ নেই।' নিভন্ত বিড়িতে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ভবভূতি ফেলে দিলে।

গেলিটা শেষ করে রসিদকে ডেকে সাবধানে সেটা তার হাতে

তুলে দিলো মুরারি।

'আচ্ছা ভবভূতি,' তার দিকে ঘুরে ন্যাকড়া দিয়ে সিসার দাগ মুছতে মুছতে মুরারি বললে, 'তুমি কেন ওসব বদ জাগায় যাও বলোতো ?'

'বদ জায়গা !' অযুত বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে হেসে উঠলো ভবভূতি, 'আচ্ছা, বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে তুমি হোটেলে খেতে না ?'

'তা খেতুম, দরকার ছিলো বলে।' মুরারি সায় দিলো।

'ধরো,' উকিলের মতন জেরা করতে লাগলো ভবভূতি 'যাদের বউ-টউ নেই তারা চিরটা কালই হোটেলে খেয়ে কাটায় ?'

'তা উপায় না থাকলে কাটায় বই কী।'

'আমারো শালার ঠিক তাই, উপায়ও নেই, অথচ দরকারো আছে।'

মুরারি কোনো কথা কইতে পারলো না।

'হুঃ, এই তিরিশ টাকায় আর তো বউপোষা পোষায় না মুরারি, তার ওপর আবার ঘাড়ের ওপর বিধবা মা রয়েচে দেশে।'

'কিন্তু', আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় মুরারি বললে, 'অনেকে ত পারে।'

'তা পারুক, কিন্তু আমি পারিনে। শালার অনেক ঝঞ্ঝাট ওতে, মেলাই ঝক্কি। আবার শুধু বৌ হলেও বা রক্ষে ছিলো, তা নয় বছরের পর বছর ধরে কেবল ছেলে বিওবে। বিয়ের আগে সব যেন শালার নজরবন্দী হয়ে থাকে, মন্ত্রপড়ার সাথে সাথে টুক টুক করে একের পর এক নিয়মমাফিক বেরিয়ে আসে। শালার একটু ইদিকউদিক হবার জো নেই, হ্যা ? শেষটায় অবস্থাতো হবে ওই হরেকেষ্টর মতন !'

'হরেকেষ্ট ! কে সে ?'

'আগে যুগবাণী প্রেসের পঁচিশ টাকার মেসিনম্যান ছিলো। তখন টানতো বিড়ি, আর এখন ফোঁকে সিগ্রেট, ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে।' নৈর্বেক্তিক ভংগিতে ভবভূতি বললে।

'মানে ?'

'মানে !' মুরারির স্বরের ব্যংগ অনুকরণ করে উঠলো ভবভূতি, 'বোঝো না, না ? শুয়ে-বসেই শালার মেয়েমানষের রোজগার ব্যাটাছেলের চেয়ে অনেক বেশী। তাই না পরিবারকে নামিয়ে দিয়ে কাজে ইস্তফা দিলো হরেকেষ্ট।'

'কী বলচো তুমি !' বিস্ময়ে অবাক বনে গেলো মুরারি।

'কেন, বিশ্বেস হচ্ছেনা বুঝি ? তা হবে কেন, ওযে বিয়ে করা বৌ !' নিজেই কম্পোজ করা গেলিটা তুলে নিয়ে ভবভূতি মেসিনঘরে চলে গেলো।

হরেকেষ্ট ! তার বৌকে দিয়ে একাজ করায় ! ছি ! ছি !!

'হরেকেষ্টর আর দোষ কী বলো ?' ফিরে আসতে আসতে ভবভূতি বললে, 'ও না-হয় পেটের দায়ে এ-কাজ করছে, কিন্তু শালার বড়লোকদের মেয়েগুলো যখন 'ফিরি-লভ' করে পেট খসায়'—

ধমকে উঠলো মুরারি, 'থামো, ভারি অসভ্য তুমি।'

'যা বলেচ !' এক মুহূর্ত থেমে নিষ্পাপ হেসে উঠলো ভবভূতি, 'আমার শালার মুখটাই ওইরকম—সত্যি কথাও অসভ্যের মতন শোনায়।'

একটু পরে মুরারি শুধোলে, 'আচ্ছা, তোমার মাকে মাসে মাসে কত পাঠাও, ভবভূতি ?'

'কেন, সেই বুঝে ঘটকালি করবে নাকি ?'

'না না, এমনি বলছিলুম। তা তোমার যদি কোনো আপত্তি থাকে ত'—

'আপত্তি কিসের, শাদা হিসেবই যখন পড়ে রয়েচে ?' থেমে থেমে ভবভূতি বলতে লাগলো, 'মাকে আট, হোটেলে খাইখরচ আট, থাকা ত এই প্রেসে মিনিমাগনা—আর ওখানে ধরো টাকা দশেক—বাকি রইলো

দু'টাকা। তা ওতে তোমার পানবিড়িটা দিব্যি চলে। শালার তিরিশ টাকায় তোফা আছি বাবা!' চুক করে মুখে একটা শব্দ করলো ভবভূতি।

মুরারি পায় বত্রিশ টাকা। বাৎসরিক ইন্‌ক্রিমেণ্টে চার বছরে এই দাঁড়িয়েছে। মুরারি ভাবলো।

'এক-এক দিন ওভার টাইমে অবিশ্যি কয়েকানা বাড়তি হয়, তা শালার ওই চায়ের বাড়তি খর্চাতেই ফক্কা। তবুও ও-থেকে ও-মাসে দু'দুটো বাইস্‌কোপ দেখেচি।'

বাইস্‌কোপ! আজকাল তাও হয় নাকি? মুরারি মনকে প্রশ্ন করলো।

'যাই বলো মাইরী', সহসা যেন অনেকটা অন্তরংগ হয়ে এলো ভবভূভি, 'শালার বাংলা বইতে স্বামী তার বৌ-এর সাথে পীরিত করবে, তাও যেন ধরি মাছ, না-ছুঁই পানি। আর গ্যাখো তোমার ওই ইংরিজি বই, যে যাকে ইচ্ছে শালার বেমালুম চুমু খেয়ে চলেছে। পর্দার আড়ালে আর কী হয় কে জানে বাবা! শুধু কী তাই,' ভবভূতি যেন রূপকথার কাহিনী শোনাচ্ছে, 'কিআ শালার উড়োজাহাজ, মটর, ইষ্টিমার, বোমা, বন্দুক, বড়ো বড়ো শহর, সমুদ্দুর, বন জংগল—শালার কী নেই!'

অসন্তুষ্ট মনেও হেসে ফেললো মুরারি, 'তুমি কী সব কথায় একটা করে শালা যোগ না করলে পারো না?

'ও শালা আমার অভ্যেস।' ভবভূতিও হাসলো, 'চাওতো মাত্রাও বলতে পারো।'

'আচ্ছা ভবভূতি', গলা নামিয়ে একসময় মুরারি শুধোলে, 'তুমি যে ওসব জাগায় যাও, কোনো রোগটোগ হয় না?'

'রোগ!' অবাক হলো ভবভূতি, 'কারুর রোগ থাকলে আবার নতুন করে হয় নাকি?'

'তোমার আছে!' গুণ-ছেড়া ধনুকের ছিলার মতন ছিটকে গেলো মুরারি।

'এক্কেবারে যে সাপ দেখলে, অ্যাঁ? বলি, শালার বড়লোকদের রোগ নেই? তবে ও শালারা ভালোমন্দ খেয়ে মুটোয় আর আমরা শাকচচ্চড়ি খেয়ে শুকোই। তাই আমাদের দেখলে গা ঘিনঘিন করে, না?'

সত্যি, মুরারির সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করতে লাগলো। সহসা ভবভূতির সংগ তার বিষবৎ মনে হলো। তার মনে হলো, এখুনি যদি এখান থেকে এক দমকে উধাও হয়ে যেতে পারতো, এক্কেবারে না-হয় রাধার আঁচলের তলায়, তবু ভালো। কিন্তু এখানে যেন তার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু আজ পেমেণ্ট হবে।

মুরারিকে চুপ থাকতে দেখে ভবভূতি বলতে লাগলো 'বুঝলে মুরারি', তার স্বর আশ্চর্য বদলে গেলো, 'বিয়ে করতে আমারো সাধ ছিলো, সাধ ছিলো ঘর বাঁধবো, সংসার করবো, আরো কত কী। একটি ছোট খাটো আমারি মতন শ্যামলা বৌ হবে, কোনো পাড়ায় অল্প টাকায় ছোটো একটি ঘর ভাড়া নিয়ে গৃহস্থালি পাতবো। বৌ রাগ করবে, মান করবে, আবার ভালোও বাসবে। ছোট একটি ছেলে হবে। বাবা বলে ডাকবে—তাকে বুকের সাথে চেপে ধরবো। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন বাড়ি গিয়ে জিরোবো, রান্না নামিয়ে তাড়াতাড়ি বৌ ছুটে আসবে হাতে

কাপড়ে হলুদ-মশলার ছোপ নিয়ে। ছেলেটাকে আমার কোলে তুলে দিয়ে আস্তে আস্তে পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকবে। একগ্লাস না-হয় খালি জলই গড়িয়ে দেবে তেষ্টা পেলে। একেকদিন হঠাৎ দেরী হয়ে গেলে বৌ হয়তো মান করে কথাই কইবে না। মুখ ভারি করে থাকবে, আর আমি আদর করে, চুমু খেয়ে, সস্তা একটা বেলফুলের মালাই না-হয় কিনে দিয়ে, দরকার হলে মাপ চেয়েও তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবো—এমনি কত সাধ কত আহ্লাদ আমারো একদিন ছিলো মুরারি,' ভবভূতির চোখ ছলছল করে উঠছিলো, গলা ভারি হয়ে আসছিলো, সহসা সে নিজেকে সামলে নিলে, 'কিন্তু শালার ওই টাকাই সব গুড়ে বালি দিয়েছে। বুঝলে হে, তোমার যত্তো মুরোদই থাকনা, ওই শালার বড়লোকের ছেলে হয়ে না জন্মালে নো পাত্তা সব জাগাতেই'—

ম্যানেজার এসে ধমকে উঠলেন, 'কিহে, দেখে শুনে কম্পোজ করতে পারো না? ম্যানাস্ক্রিপ্টের তিনটে লাইনই বাদ দিয়ে গেছো, স্মল্ পাইকার জায়গায় মাঝে মাঝে আবার পাইকাও চালিয়েছো। হেডিংটা না তোমায় এ্যান্টিকে করতে বলেছিলুম? বলি, আজকাল নেশাভাঙ ধরেচো নাকি?'

মুরারি আমতা আমতা করতে লাগলো।

মাইনে পাবার সাথেসাথে যেন একমুঠো স্বর্গ হাতে এলো। মুরারির মনে হলো, এই সন্ধ্যাটি ভারি সুন্দর, দেহে আর মনে কেমন-যেন-একটা নতুন আমেজ এসেছে। ফট্ করে তিনানা দিয়ে অসময়ের একটা ছোট্ট কপি কিনে নিয়ে ও হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে রওনা হলো।

দরজার কাছে দেখা মুখোমুখি। পরেশ তার বৌকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুচ্ছে। নীল শাড়িটায় তার বৌকে কিন্তু মানিয়েছে বেশ!

'পরেশদা যে, কোথায় ?'

'এই ভাই তোমার বৌদিকে নিয়ে একটু বাইস্‌কোপে যাচ্ছি।' পরেশ টেনে-টেনে বলতে থাকে, 'এই বাঁধাবাঁধির মধ্যে মাঝে-মাঝে একটু-আধটু হাওয়া বদল না হলে, বুঝলে কিনা······হেঁ হেঁ হেঁ'—হাসি আর ইসারায় নিজের উক্তি অসমাপ্ত রাখলো পরেশ।

'বেশ। বেশ।' সানন্দ সায় দিল মুরারি।

রাধা যেন কোথায় ছিলো, মুরারিকে দেখেই ছুটে এলো।

'দেখলে পরেশের বৌকে ?' উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠলো রাধা।

'হ্যাঁ, দেখলুম বইকী।' ঘরে ঢুকলো মুরারি।

'কী সুন্দর মানিয়েচে, না ?' সেটা যেন রাধারই গৌরব, এমন ভাব দেখালো সে।

'সত্যি।' বিছানায় বসলো মুরারি, 'তোমায় কিন্তু আজ ভা-রী ভালো দেখাচ্চে।' মুগ্ধদৃষ্টিতে রাধার দিকে চাইলো মুরারি।

'ছা-ই !' কৃত্রিম কোপে মুখ বাঁকালো রাধা, 'জানো, ওটার দাম কতো ? দশ টাকা মাত্তর ! আজই পরেশ কিনে এনেচে।'

'তাই নাকি ?' বিস্ময় প্রকাশ করলো মুরারি, 'খুব সস্তাতো।'

'হ্যাঁ গো ?' কাছে সরে এলো রাধা।

'ওদের কথা ছেড়ে দাও রাধু। শাড়ি ছাড়া যাদের রূপ খোলেনা তারা শাড়ি পরেই সাজে,' মুরারি রাধার মুখটা তুলে ধরলো, 'কিন্তু আমার রাধারাণীর এমনিতেই'—

'ছাড়ো ছাড়ো,' নিজেকে চকিতে মুক্ত করে নিলো রাধা, 'দেখচো দরজাটা হাঁ-করা রয়েচে।' রাধা উঠে গেলো দরজা বন্ধ করতে। মুরারি চিৎ হয়ে সটান বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। বিছানাটা আজ কী নরম আর মিষ্টি-মিষ্টি ঠেকছে। দেহে যেন রোমাঞ্চ জাগায়। পাশ বালিসটা

কাছে টেনে নিলো মুরারি।

রাধা এসে একেবারে ওর বুকের ওপর উবুড় হয়ে পড়লো। একটা তীব্র ঘা খেলো মুরারি—দেহে নয় রক্তে। রাধার পিঠের ওপর দুহাত আড়া-আড়ি ভাবে রাখলো সে।

মুখের থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে রাধা ডাকলো, 'ওগো!'

'কী!' আবেগে মুরারির গলা কেঁপে গেলো। রাধার এই ঘনিষ্টতম সান্নিধ্য আজ তার কাছে অপরূপ লাগছে। এমন আত্মবিস্মৃত সম্পূর্ণ সমর্পণ: রাধার সমস্ত চোখমুখ যেন প্রেম ও প্রীতির রসে টলটল করছে। চোখে কী অতলস্পর্শতা—নিজের স্পষ্ট প্রতিফলন তাতে মুরারি দেখলো। বারবার অবগাহন করলো মুরারি, গোটা দেহে তার মধুর একটা শিহরণ খেলে যেতে লাগলো। ভবভূতির জন্য একবার দুঃখ হলো তার—টাকা! টাকা দিয়ে শুধু দেহটাকেই অধিকার করা যেতে পারে। কিন্তু—

রাধা বললে, 'আজ মাইনে পেয়েচো, নাগো?'

'হ্যাঁ।'

'কাল আমায় অমন একটা শাড়ি কিনে দিওনা,' আব্দার করে রাধা বললে, 'ভারীতো দশ টাকা।'

'পাগল! পরেশ পায় ষাট টাকা, দশটাকা ওর হয়তো কিছু নয়। কিন্তু আমার,'—

'ন্‌না।' ছেলেমানুষের মতন মাথা নাড়লো রাধা, 'আমার এ-সাধটা তোমায় রাখতেই হবে।'

'কিন্তু'—

'না না কিন্তুটিন্তু নয়,' অভিমানে তার স্বর ক্ষুব্ধ হয়ে এলো, 'আমি কিছু বললেই তুমি শুধু এড়িয়ে যাবে, হুঁ!'

'তবু শোনোই না'—

'না, আমি শুনবোনা কোনো কথা। ইচ্ছে করলে বুঝি তুমি আর দশটা টাকা উপরি উপায় করতে পারো না, না ? কতো লোক'—

'কতো লোকের কথা ছেড়ে দাও রাধা,' বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুরারি, 'তাদের ভাগ্য আর আমার ভাগ্য এক নয়।'

'আমি কিছু চাইলেই তুমি খালি ভাগ্যের দোহাই দেবে, তা'কি আমি বুঝিনা ভেবেচো ?' রাধার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে মুরারি জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো।

'আদত কথা, আমায় ফাঁকি দিতেই তুমি চাও।'

কী কর্কশ স্বর রাধার ! মুরারি আহত হলো। বললে, 'তা যদি বোঝোই তবে আর বারবার চেয়ে নিজেকে ছোট করো কেন ?'

'আমি ছোট ! অ্যাঁ ?' রাধা একবার ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

'নাঃ, ঘাট হয়েচে। ছোট তুমি নও, ছোট আমি, ছোট আমার চোদ্দপুরুষ।' শার্টটা খুলে আল্‌না লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো মুরারি।

'অর্থাৎ ঘুরিয়ে আমার বাপমাকেই ছোট বলা হলো, না ?' রাধা গর্জন করে উঠলো।

'কী শুরু করলে এই সন্ধেবেলায় ?' বিরক্ত হয়ে উঠলো মুরারি, 'সারাদিন খেটেখুটে এলুম, কোথায় একটু'—

'আর এপাশে চব্বিশ ঘণ্টা আমায় সিংহাসনে বসিয়ে রেখেচো ! দাসিবাঁদির মতন খেটে খেটে'—

কথার পিঠে কথা বললো মুরারি, 'তা দাসিবাঁদি রাখবার সামথ না থাকলে ঘর সংসারের কাজ নিজেদেরই করতে হয়। তুমি আর নতুন দেখাচ্ছো কী ?'

'হ্যাঁ, আর কথায় কথায় এমন লাথি ঝাঁটা খায়।'

'লাথি ঝাঁটা আবার কে দিলো শুনি ?' ধমকে উঠলো মুরারি, 'খালি

গায়ে পড়ে ঝগড়া করতেই শিখেচো।'

'নিমকারামের মতন মিথ্যে কথা বলোনা বলচি,' কেঁদে ফেললো রাধা, 'রোজরোজ এই গঞ্জনা, হেনেস্তা'—

'আর তুমি আমায় ফুলচন্নন দিয়ে পূজো করো, না?' মুরারিও মুখিয়ে উঠলো। 'ভারীতো দুটো রান্না করে দাও'—

'কী!' এক তীব্র চীৎকার করে উঠলো রাধা।

'অমন শেয়ালের মতন চেঁচাতে হলে ছাদে কিম্বা পায়খানায় যাও।'

'কোথাও যাবোনা আমি। বিষ খেয়ে একেবারেই তোমায় নিস্তার দেবো।'

'তাহলেও তো বাঁচতুম।' মুরারি বললে, 'বেশী করেই খেয়ো, আধমরা হয়ে যেন আবার শেষে ফ্যাসাদে ফেলোনা।'

'আমি আজ এক ফ্যাসাদই হয়েচি, না?' একেবারে কাছে সরে এসে মুখ ঝামটা দিলো রাধা, 'কেন, আমি মরলে আবার নতুন একটিকে এনে সুখে ঘর করতে পারো বুঝি?'

'পারিই তো।' মুরারি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

'অ্যাঁ, এ্যাদ্দূর!' তার চীৎকার শুনে মনে হলো এখুনি যেন সে হার্টফেল করবে।

দরজার বাইরে কয়েকজনের চাপা হাসির মৃদু আওয়াজ ওদের কারুরই কানে এলো না।

'কথাটা এ্যাদ্দিনে মুখ ফুটে একবার বললেই পারতে।' সরোষ-ক্রন্দনে রাধা বললে, 'নিজেই না-হয় আমি ঘটকালি করতুম।'

'কেন, নিজে বুঝতে পারো না?' তীব্রকটুকণ্ঠে মুরারি বললে, 'মা হবার মুরোদ নেই, খালি সাজতে-গুজতে, গিলতে আর গলা বাজাতেই পারো। বাঁজা মেয়েমানুষ কোথাকার! আমায় নিব্বংশ করতে চলেচো,

আবার মুখ তুলে কথা কইতে লজ্জা করেনা তোমার ?'

সহসা চোখে টলটলে কয়েকফোঁটা জমাট অশ্রু নিয়ে মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেলো রাধা। তার সব চেয়ে নরম জায়গায় আজ আঘাত হেনেছে মুরারি। সমস্ত দেহটার সাথে নির্বাক ঠোঁট দুটো তার কয়েকবার থরথর করে কেঁপে উঠলো।

'তুমি! তুমি পর্যন্ত শেষে আমায় এই বলে খোঁটা দিলে ?' বালিসের ওপর মুখ গুঁজড়ে পড়লো রাধা। 'ভগবান মেরে রেখেছেন বলে তুমিও যখন তখন মারবে ? একি আমার নিজের দোষ ? ঠাকুরের কাছে আমিও কী কম মাথা কুটেচি।' রাধা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। মুরারি চুপ করে রইলো।

'বেশ চাইনে, চাইনে আমি আর এখানে থাকতে। আমায় এখুনি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আবার বিয়ে করে তুমি বংশ রক্ষে করো।' উঠে দাঁড়ালো রাধা।

ও যেন উন্মাদিনী হয়ে গেছে। চড়্‌চড়্‌ করে সহসা ব্লাউজটা দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে একরাশ মাদুলী গলা থেকে টেনে নিয়ে মুরারির দিকে ছুঁড়ে মারলো। লজ্জাসরমও যেন রাধা আজ হারিয়ে ফেলেছে : হাতের থেকে বেরুলো কতকগুলো, তারপর কোমর থেকে। অবাক হয়ে গেলো মুরারি : রাধা আইনত তার স্ত্রী, তার দেহের, এমনি কী প্রত্যেকটি লোমকূপের ওপর পর্যন্ত তার ন্যায়সংগত দাবি ও পরিচিতি স্বীকৃত। অথচ সেও জানতো না এতগুলি মাদুলি তার দেহের কোন্‌ আনাচে-কানাচে এতদিন আত্মগোপন করেছিলো। সত্যি সে অবাক হলো।

পায়ের কাছে উবুড় হয়ে কাঁদছে রাধা। যেন শতধা হয়ে ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে। মুরারি স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে রইলো। তার মনটাও

একবার ব্যথিত হয়ে উঠলো। রাধার পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার জন্য একবার ঝুঁকে পড়লো মুরারি, কিন্তু স্পর্শ করতেও সাহস হলো না তার।

রাত্রে সেদিন আর রান্নার পাট হলো না। দোকান থেকে খাবার এনে খেলো মুরারি—কিন্তু শত অনুনয়েও রাধা মুখে কুটোটি নাড়লো না। আত্মগ্লানিতে মুরারির মনটাও ভরে উঠেছিলো। অমন কথাগুলো সত্যিই তো আর রাধাকে সে বলতে চায়নি—হঠাৎ রাগের মাথায় বেরিয়ে গেলো। কিন্তু তা'কি রাধা বুঝবে? সত্যি ওর কী দোষ, মুরারি ভাবলে, কোন্ মেয়েমানুষেরই বা মা হতে সাধ না যায়? কিন্তু কী করবে রাধা, ভগবান যে সত্যিই ওকে মেরে রেখেছেন। মুরারির সমস্ত রাগ ভগবান নামক জীবটির ওপর গিয়ে পড়তে লাগলো, আর রাধার প্রতি গোটা মনটা সহানুভূতি ও অনুকম্পায় ভরে উঠলো।

ঘুম আসছে না কারুর চোখেই। বিছানার এপাশে জায়া ওপাশে পতি, মাঝে কোলবালিস দুটো ব্যবধানের পরিখা টেনেছে। নিজের বালিসটা উঠিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে রাধার কাছে সরে এলো মুরারি। রাধার উলংগ পিঠে স্নেহ পরশ রাখলো। এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে দিলো রাধা।

'আমায় মাপ করো রাধু.' অনুনয়ের সুরে মুরারি বললে, 'সত্যি আমার অপরাধ হয়েচে।' রাধা কোনো উত্তর দেয়া হয়তো প্রয়োজন মনে করলো না।

একটু থেমে মুরারি আবার বললে, 'তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, এমন আর কক্খনো হবে না। রাগের ঝোঁকে যা হয়ে গেছে তার জন্যে আমায় মাপ করো, লক্ষ্মিটি।' রাধার গায়ে আবার হাত রাখলো মুরারি। রাধা

এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। মুরারি ধীরে ধীরে তার পিঠ থেকে কাপড়ের গোছা সরিয়ে দিয়ে হাত বুলোতে লাগলো। কী উষ্ণ রাধার নিটোল দেহ! মুরারি রাধার গা ঘেঁষে এলো, রাধাও সরলো একটু দেয়ালের দিকে। মাঝের বালিসটা গেলো চেপ্টে।

'এপাশে ফেরো, লক্ষ্মিটি।' রাধার কাঁধ ধরে আকর্ষণ করলো মুরারি, কিন্তু রাধা যেন বিছানার সাথে জমে গেছে—এমনি অটল।

'অন্যায় না-হয় একটা করেই ফেলেচি,' বালিশের ওপর কনুই-এর ভর দিয়ে একটু উঠে বসলো মুরারি, 'কিন্তু তার ক্ষমা কী নেই? এমনি করেই কী তার শাস্তি দিতে হয়? আমার মনটাও কী দগ্ধে দগ্ধে যাচ্ছে না?' মুরারির কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। মুখ নামিয়ে সে রাধার গালের ওপর গাল রাখলো। ছ্যাক করে উঠলো রাধা। চকিতে মুখটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। বুকের থেকে মুখ ছিনিয়ে আনবার জন্য টানাটানি করতে লাগলো মুরারি।

'ছাড়ো বলচি।' চাপা গর্জন করে উঠলো রাধা।

'না ছাড়বো না। যা-ইচ্ছে তুমি করো।' শিশুর মতন আব্দার করলো মুরারি।

'ভালো হবে না বলচি।'

'না হোকগে।' বেপরোয়া মুরারি, 'আমায় যদি দু'ঘা মেরেও তোমার শান্তি হয়, তা'লে হোক। আমারো শাস্তিটা ওই সাথে হয়ে যাক।'

'থাক, আর সোহাগ দেখাতে হবে না, খুব হয়েচে। পাষণ্ড, নিষ্ঠুর কোথাকার!'

'যা ইচ্ছে বলো। অন্যায় যখন করিচি, তখন সব সহ্য করবো। তবু তোমায় পাশ ফিরতেই হবে।' বিনীত অনুরোধে যেন গলে গেলো

মুরারি। মাঝের কোলবালিশটা তুলে ছুঁড়ে দিলো নিচে।

'কী শুরু করেচো! ছেড়ে দাও আমাকে।' রাধার রাগ তখনো যায়নি, 'নতুন কার কাছে যাবে যাওনা।'

'ন্‌নানা।' রাধার গলার কাছে গোরুর মতন অসহায়ভাবে নাক ঘসতে লাগলো মুরারি, 'তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবনা।

'কেন, আমার চেয়ে ক-ত্তো সুন্দর মেয়ে রয়েচে!' বিদ্রূপের কণ্ঠে রাধা বললে, 'তোমার ছেলের মা হবে, বংশ রক্ষে করবে!'

'থাকগে। চাইনে ছেলে আমি। আমিই মরলে আবার আমার বংশ কী?' একটু আস্তে আস্তে মুরারি বললে, 'আর ছেলেপিলে হলে বুঝি মেয়েদের বিচ্ছিরি দেখতে হয়ে যায় না? ওইতো শাকচুন্নির মতন ঝোলাঝুলো চেহারা পরেশের বৌ-এর—আবার নীলাম্বরীতে কী ছিরিই না খুলেছিলো! আহ্‌হা!!' তীব্র ঘৃণায় মুরারী রী রী করে উঠলো। 'অমন শাড়ি পড়লে তোমায় অনেক বেশী সুন্দর দেখায়।' রাধার বুকের উপর মাথা রাখলো মুরারি।

জোর করে মাথাটা সরিয়ে দিয়ে রাধা বললে, 'থাক, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই।'

'আদিখ্যেতা বইকী। অমন সাজলে আমার রাধুকে ঠিক রাণীর মতন দ্যাখায়।'

'খুব হয়েচে।' পাশ ফেরবার চেষ্টা করলো রাধা।

'বটে!' সহসা যেন মুরারির সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠলো, 'ভারীতো দশটাকা দাম!'

'তাওতো দিয়ে উল্টে গেলে!' ঠোঁট ওল্টালো রাধা। 'অমন যদি করো তা'লে কিন্তু আমি নিচে গিয়ে শোব।' মুরারির দৃঢ় আলিংগন থেকে মুক্ত হবার প্রাণান্ত প্রয়াসে রাধা ছটফট করতে

লাগলো।

'দেখো, কাল তোমায় যদি অমন একটা শাড়ি না এনে দিয়েছি'—

একটা কঠিন শপথ করতে যাচ্ছিলো মুরারি, রাধা বাধা দিলো, 'থাক আর স্বাখাদেখিতে কাজ নেই। অনেক দেখলুম। এখন ছেড়ে দাও আমায়।'

'এই কথা!' মুরারিকে যেন কী এক অদ্‌ভুত নেশায় পেয়েছে।

অর্ধশিক্ষিত, দরিদ্র কম্পোজিটর মুরারি। বত্রিশ টাকায় সে যৌবনকে আহুতি দিয়ে এসেছে দিনের পর দিন।

তার জীবনব্যাপী দারিদ্রের সীমাহীন মহাসাগরে আজ সহসা একটি বালুচর হয়ে জেগে উঠলো।

ঢেউ এর পর ঢেউ এসে তরংগ তুলেছে তার দেহের সৈকতে।

অকস্মাৎ মুরারি শিয়রের তলা হতে সন্থ মাইনে পাওয়া নোটগুলি থেকে দশটাকার একটি নোট তুলে নিয়ে রাধার হাতে গুঁজে দিলো, 'বিশ্বাস না হয় আগাম দিয়ে রাখলুম। হলো তো এবার?'

শত চেষ্টাতেও অশ্রুসজল মুখে রাধা হাসি চাপতে পারলো না।

চাপা খুশিতে সে যেন বিস্তৃত হয়ে উঠলো।

কার্তিক
১৩৪৯

সমুদ্র-মন্থন

(শ্যামলকুমার মিত্র-কে)

মাত্র ছয় মাস নবদ্বীপের কোন্ এক টোলে কাটাইয়া স্বনামধন্য ভট্টাচার্য বংশের কপলে অবশেষে এক শাস্ত্রবিজ্ঞ পণ্ডিত কপিলেশ্বর হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

গ্রামে একটা আলোড়ন হওয়া স্বাভাবিক। বর্ষীয়ানরা গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিলেন, এমনটা যে হইবে তা তাঁরা পূর্ব হইতেই জানিতেন। হাজার হইলেও বাপ পিতামহের রক্ত তো দেহে বহিতেছে! আর, অমন উঠ্‌তি বয়সে একটু-আধটু ইদিক-উদিক অনেকেরই হয়। কেন শোন নাই 'ইয়ের' কথা—? তাঁরা ইতিহাসের অসংখ্য নজীর টানিয়া নিজেদের উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিয়া দেন। সামনে তরুণের দল ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে, আড়ালে হয়ত বলে নানা কথা। সমবয়সী ভূতপূর্ব ইয়াররা দূর হইতেই করে পৃষ্ঠ প্রদর্শন। এবং সব চেয়ে ব্যথা পায় ও বিস্মিত হয় বেশী হারাণ বাগ্দীর বিধবা মেয়ে কুলটা সৌরভী। তার একদা-অতি-পরিচিত অন্তরংগ বঁধুটার সহিত পুনর্মিলনের আশায় একদিন সে কাশশ্যাওড়া পুকুরের ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সে-পথেই যখন অবশেষে কপিলেশ্বর ডান হাতে নারায়ণ শিলা আর বাঁ হাতে নৈবেদ্যের পুঁটুলি লইয়া আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁর সেই দেবপ্রতিম চেহারার সুমহান গাম্ভীর্যের দিকে চাহিয়া সৌরভীর মুখে কোন কথা তো জোগাইল না, এমন কি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেও তার সারা দেহ মন অসহ্য গ্লানিতে রী রী করিয়া উঠিল। অদৃশ্য ও তফাৎ হইতেই টিপ্ করিয়া এক আভূমি প্রণাম সারিয়াই সে সরিয়া গেল। এই কী সেই—

কপলে!

অমন বংশে জন্মিয়াও বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে 'ইয়ার'ই রহিয়া

গেল, চুল ছাঁটিল দশ-আনা ছ-আনা, যজ্ঞোপবীত নামিতে নামিতে কোমর অবধি আসিয়াই একেবারে গেল নিশ্চিহ্ন হইয়া। মুখে সর্বদা বিড়ি কিংবা সিগারেট ; আড়ালে অন্য নেশা। কথার তোড়ে অশ্লীলতার তুবড়ি ; এবং বাগ্দী পাড়ার ভ্রষ্টারা গলা জড়াইয়া গলাগলি করিলেও কুলবধুরা ঘোমটা টানে আবক্ষ। কিন্তু প্রতিবাদের. যো নাই,—বংশানুক্রমিক গ্রামস্থ একমাত্র পুরোহিত বংশের শেষ প্রদীপ! নেপথ্যে পাড়ার লোক ছি-ছি করে, বাপ মা নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেন।

—তুই কী শেষে বংশের নাম ডোবাবি কপিল? ধরা গলায় জননী জিজ্ঞাসা করেন।

—মানে? কারণ-প্রসাদে লালচোখ কপিল প্রতি প্রশ্ন হানে।

—হারাণের বিধবা মেয়েটার সংগে—। লজ্জায় তিনি আর নিজের কথা শেষ করিতে পারেন না।

—যাই বলো কিন্তুক······হেঁ হেঁ—টানিয়া টানিয়া হাসিতে গিয়া সহসা কপিল সচেতন হইয়া ওঠে। মনে হয় কথাটা বলা ঠিক হইতেছে না। মা তো সাক্ষাৎ ভগবতী, স্যাঙাৎ নয়, যার কাছে কুলটা নারীর প্রশস্তি রসাইয়া করে চলে।

কপিল সহসা গম্ভীর হইয়া যায়। বলে, আরেঃ ছ্যা ছ্যা! তুমি বুঝি ওসব বিশ্বেস করে বসে আচো মা? তোমার গিয়ে, কে নাগিয়েচে শুনি?

কাণে আঙুল দিয়া উদ্গত অশ্রু চাপিয়া মা কিন্তু আগেই সে-স্থান ত্যাগ করিয়াছেন।

তবু একদিন এক শুভক্ষণে কপিলের বিবাহ হইয়া গেল। জন্মিলে বিবাহ আর মৃত্যু নাকি সাংসারিক জীবের বাঁধা পরিক্রমা।

ফুলশয্যার রাত।

জুতা শুদ্ধুই খাটে জড়োসড়ো হওয়া বধূ নির্মলার গা ঘেঁসিয়া উঠিয়া বসিল কপিল।

—এবার খানিকটে নিশ্চিন্দি হওয়া গেল যাহক। কারুর আর সাধাসাধি করতে হবেনা। আপন মনেই কিছুক্ষণ বিড় বিড় করিল সে। কিছুই না বুঝিয়া নির্মলা মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

—আরে, একেবারে যে বোবা মেরে গেচ? তোমার গিয়ে, ঘোমটাটা খোলই না ছাই। অনুরোধের ভংগীতে কথাটা বলা হইলেও কাজটা করা হইল সম্পূর্ণ শারীরিক শক্তিতে।

নববধুর প্রথম পরিচয়ের মধ্যে তার জীবনের প্রথন পুরুষের কাছে অসহ্য লজ্জার যে একটি সুমধুর মাধুর্যের পরিবেশ গড়িয়া ওঠে তা যেন মুহূর্তে কঠিন শিলার উপর নিক্ষিপ্ত কাঁচের বাসনের মত খান্ খান্ হইয়া গেল।

—বাঃ! নির্মলার দিকে চাহিয়া জিব আর তালুর ঘর্ষণে হ্রেষার মত হর্ষধ্বনি করিল কপিল।

—তোমার গিয়ে, তুমি মাইরী কিন্তু বে-শ!

অদ্ভুত আবেশে নির্মলার চোখের পাতা নিমীলিত হইয়া আসিল।

কিন্তু ইহার পর কপিল যা সুরু করিল, নব যৌবনের অত্যুগ্র কামনা বুকে লইয়াও তাতে বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল নির্মলা। মাংস-লোলুপ শকুনির মত এক পক্ষ দেহ-লালসার বর্বর উত্তেজনায় ষোলটি বসন্তের একটি কুমারী দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল আর অপরপক্ষ দাঁতে দাঁত দিয়া, নিরুদ্ধ অশ্রু ও দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া নিশ্চল পড়িয়া রহিল। স্বামী দেবতার সর্বময় অধিকারে বাধা দেয়া পতিধর্মের বিরোধী—এই শিক্ষাই সে এতকাল পাইয়া আসিয়াছে। জন্ম-জন্মান্তরের এই পবিত্র সম্বন্ধ বহু পুণ্যফলেই নারীর ভাগ্যে ঘটে।

আজন্ম শুনিয়াছে সংখ্যাহীন ইতিকথা-উপকথার উদাহরণ। তার পিতাও একজন সুপণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। নিজে করকুষ্ঠি দেখিয়া সমস্ত কিছু বিচার বিবেচনা করিয়াই না এ বিবাহ দিয়াছেন। এবার সবই ভগবানের হাত আর নিয়তির বিধান।

সারারাত ঘুম আসিল না কাহারো চোখে। ভোরের দিকে এক সময় নির্জীব কণ্ঠে কপিল জিজ্ঞাসা করিল—ক্যামন নাগচে ?

কেমন লাগিতেছে ? কী উত্তর দিলে দেবতা খুশি হইবেন ?

নির্মলা ইতস্তত করিতে লাগিল।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কপিল আবার প্রশ্ন করিল, বিয়ের আগে এ সব নিয়ে কী ভাবতে বলতো ?—আরে, ইদিকে ফেরোই না ছাই।

কী ভাবিত ? আজ তার কী বলিবে নির্মলা ?

যদি দেবতার মনঃপুত না হয়।

তার মনে পড়িল ঠাকুমার মুখে শোনা রূপকথার কাহিনী। সোণার কাঠি লইয়া পক্ষীরাজে চড়িয়া অচিন্‌দেশের রাজপুত্র আসিতেছে ঘুমপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাইতে। রাজকন্যা কী সত্যই ঘুমায়, না, প্রিয়-পরশের আশায় চোখ বুজিয়া ঘুমের অছিলা করে শুধু ? অবচেতন মনের কোণে হাওয়ার আঘাতে যখন রাজপুত্রের পক্ষীরাজের পক্ষবিধূনন ধ্বনি আসিয়া অনুরণন তোলে, তখন যে ঘুম আর নামেনা চোখে,—নামে আশ্চর্য এক মোহের মিষ্টি মধুর তন্দ্রার অলস আবেশ। মনের ফাল্গুনী উদ্বোধনে দেহের শিরা-উপশিরা ও শোণিতে জাগে কী এক নব অনুভূতির আবিষ্কারের রহস্য-রোমাঞ্চ। কত রাত্রে এমন হইয়াছে নির্মলার। তাদের ঘরের ঝিলিমিলি দিয়া জলন্ত চাঁদের রূপালি আলো কত রাত্রে বার্ধক্য-পীড়িত ঠাকুমার মুখের রেখায় রেখায় অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, নির্নিমেষ

নিরীক্ষণে আত্মসচেতনতাও হারাইয়া ফেলিয়াছে নির্মলা। ঘুমন্ত ছোট ভাইটিকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া অদম্য কৌতুহলে বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া মনের সমস্ত জিজ্ঞাসা উপচাইয়া দিয়াছে সে।—

—তারপর, ঠাক্‌মা? তারপর?

—তারপর! ঠোনা দিয়া ঠাকুমা হাসিয়া বলিতেন, তারপর রাজ-পুত্তুর এলেই দেখতে পাবি'খন। এখন ঘুমো।

—ন্‌না। আব্দার করিত নির্মলা।

—না না কিলো? ঠাকুমা যেন কৌতুকে ফাটিয়া পড়িতেন, তোর কী তা'লে এখ্‌খুনি রাজপুত্তুর চাই নাকি?

—যাও! ভা—রী ইয়ে তুমি। সলজ্জ ভংগিতে পাশ ফিরিত নির্মলা। ঠাক্‌মাটা যেন কী!

কিন্তু ঘুম আর আসিত না সহজে।

তা-র-প-র?

সেই রাজপুত্র!

বিরক্ত হইয়া কপিল জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, ঘুমুলে?

চেষ্টা করিয়াও কোন উত্তর দিতে পারে না নির্মলা। আর দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিবার মত উৎসাহও তখন কপিলের স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

বহু আশা করিয়াই বাপমা' একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বহু প্রচলিত প্রবচনের মত তাঁদের সেই বহু আশাতেই ভস্মপাত হইল, তখন বোধ করি মনের দুঃখেই একমাসের আড়াআড়িতে তাঁরা দু'জনে পট পট করিয়া মরিয়া গেলেন।

মৃত্যুর শোকে কপিল প্রথমে অন্য দশটা সন্তানের মতই সনাতনী নিয়মে কিছুটা কাঁদাকাঁটি করিল, কিন্তু সত্যকার ক্ষতিটা তার উপলব্ধি

হইল দিন কয়েক পরে,—সঞ্চিত পৈত্রিক বিত্তের দিকে তাকাইয়া।

শুধু উনুস্বার উচ্চারণেই যার জিব-তালু অসহযোগ করে, মন্ত্রের ব্যবসা তার মনে স্থান পাইবার কথাও নয়। কিন্তু সংসারের ভারটা সরাসরিই তার মাথায় আসিয়া পড়িল। সংসার বলিতে বিধবা পিসি, বিশুদ্ধ কুলীন বলিয়া স্বামী পরিত্যক্তা দুটি বোন, স্ত্রী নির্মলা আর তার মাসতিনেকের শিশুপুত্র। এতগুলি প্রাণীর জীবিকা নির্বাহ সহজ কথা নহে। একটা শুষ্ক প্রণামের দরুণও অব্রাহ্মণরা দু'দশ টাকা প্রণামী দিতে পারে, কিন্তু স্রেফ্ বংশ পরিচয়ে মুখ দেখাইয়া একটি আধলাও পাইবার উপায় নাই।

—কিগো, এমন নিষ্কম্মা হয়ে থাকলে তো আর চলে না। সতেরো বছরের তরুণী সেদিনকার সেই লাজুক নির্মলা আজ পাকা গৃহিণীর মত চোখ বড় বড় করিয়া কথা বলে।

—কিন্তুক, কী করবো আমি? গলার স্বরে সেই কপিলকে আজ চেনা দুষ্কর।

—এখেনে যখন কিচ্ছু হবে না, একটু থামিয়া নির্মলা আবার বলিল, তখন না-হয় কলকেতায়ই যাও। বড়দার কাছে গেলে হয়ত—

নির্মলার বড় ভাই ত্রৈলক্যচরণ কালিঘাটে থাকিয়া সময়ে পুরুত ও অসময়ে পাণ্ডাগিরি করিয়া জীবিকার্জন করেন। তাঁর কাছে গিয়া দাঁড়াইলে স্বামীর একটা হিল্লে হইবেই—নির্মলার দৃঢ় বিশ্বাস।

কপিল অবশ্য তার সম্বন্ধোচিত আত্মসম্মানবোধে প্রথমে রাজি হয় নাই। কিন্তু অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যাইতেই হইল।

এক শুভদিনে গাঁজার কলিকা হাতে লইয়া ছল্‌ছল্ চোখে বন্ধুরা চাহিয়া রহিল, বিদায়-ব্যথায় সৌরভী, ক্ষেমদা, নিস্তারিণী প্রভৃতি মেয়েরা ইষ্টিশানের পথের ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চোখে আঁচল চাপিয়া ফোঁস্‌ফোঁস্

করিয়া কাঁদিতে লাগিল, পিসীমা দিলেন গতানুগতিক উপদেশবাণী, গ্রামের সকলে ছাড়িল স্বস্তির নিঃশ্বাস, আর দরজার পাশে সন্তানক্রোড়ে দণ্ডায়মান নির্মলার মুখে আষাঢ়ের মেঘ আসিল নামিয়া।

ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু প্রসাদী ফুলবেলপাতা এবং গলাবন্ধ কোটটির চোরা পকেটে নির্মলার কাণের দুল দুটি মূলধন করিয়া কপিল টিকিট কাটিল কলিকাতার।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া দীর্ঘ পাঁচ মাসেও তার কাজকর্মের কোন কুলকিনারাই হইল না। বহুবিধ আশ্বাস দিয়া অবসর সময়ে ত্রৈলক্যচরণ অনেক চেষ্টাই করেন কিন্তু তাঁর সে সবই হয় নিষ্কাম ধর্মের সমগোত্রীয়।

কপিল অবশ্য প্রথমে কলিকাতা দেখিয়া রীতিমত বিস্মিত হইল। কিন্তু কিছুদিনেই সে-বিস্ময় বাড়িল যখন বুঝিল কলিকাতায় আর যাহাই থাক চাকরী তৈরীর কোন মেশিন নাই। এবং এ-বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে নবলব্ধ স্থানীয় কয়েকটি বন্ধুর অমায়িক সাহচর্যে সে প্রতিদিন নব নব বিস্ময়ে হতভম্ব হইতে থাকিল।

সারাদিন ও অধিক রাত পর্যন্ত তার পাত্তা পাওয়াই দায়!

অবশেষে ত্রৈলক্যচরণ একদিন কহিলেন, পরীক্ষে-টরীক্ষে পাস না দিলে এখেনে চাকরী বাকরীর কোন সুবিধে হবেনা কপিল। তার চে' বরন্—

গোরুর মত কৌতূহলী দৃষ্টি মেলিয়া কপিল ত্রৈলক্যচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ত্রৈলক্যচরণ কহিলেন, আমি বলি কী, ঐ পুরুতগিরিতেই না-হয় লেগে যাও।

অসহায়ভাবে কপিল উত্তর দিল, কিন্তু কিছুই যে জানিনে বড়দা। নইলে গাঁয়ে ত আর যজমানের অভাব নেই।

—তা'লে পূজোটাই শিখে নাও।

—কিন্তু—

—কিন্তু-টিন্তু এতে নেই। বাধা দিয়া তিনি কহিলেন, একমাসের মধ্যে তোমায় আমি শাস্তর-মন্তর-টন্তর সব শিখিয়ে দেব। সে ভাবনা ক'রনা। তারপর একটু থামিয়া গলা নামাইয়া. আবার কহিলেন, আরে বাপু, চারানা-আটানা দক্ষিণেয় কী আর মন্তর পড়তে হবে সাতকাণ্ড রামায়ণ? কথায় বলেনা, যেমন গুড়—তেমনি মিষ্টি। হুঁ।

—তবুতো সংস্কিতোটা জানা থাকলে—

—সংস্কিতো জেনে আবার কী হবে শুনি, অ্যাঁ? এবার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন ত্রৈলক্যচরণ, জানো, আজকাল সব পূজো বাংলায় চলে? সংস্কিতো আর বাংলায় তফাৎ কোথায় বলো তো? স্রেফ্ একটা উনস্বার বিসর্গ বইতো নয় হে।

কপিলের এমন পাণ্ডিত্য বা ভূয়োদর্শন নাই যে ইহার প্রতিবাদ করে। বাধ্য হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

—কাল থেকে আমিই তোমায় শাস্তর পড়াবো, বুঝলে? একসময় ত্রৈলক্যচরণ কহিলেন।

পরদিন কিন্তু অধ্যাপনার প্রথম পাঠ লইতে গিয়াই কপিল খাইল এক প্রচণ্ড ধমক।

—অমন দন্ত ক্লাইভ ষ্ট্রীট করচো যে? টাকা রোজকার কী ছেলে-খেলা নাকি? গম্ভীর আর রাশভারী হবে, নইলে এ লাইনে অচল।

অতএব কপিল রীতিমত গম্ভীর হইল। শুধু তাহাই নয়, ত্রৈলক্য-চরণের পরামর্শ মত একদিন প্রকাণ্ড মাথাটির ঊর্ধকেন্দ্রে তরমুজের বোঁটার মত একটি শিখা রাখিয়া বাকিটা নিশ্চুল করিয়া ফেলিল। বার্ণিস করা পাম্‌সুর বদলে শ্রীচরণেষু হইল একজোড়া তালতলার চটি। মিহি জরিপাড়

শান্তিপুরীর স্থান অধিকার করিল শাদা থান। এবং ফিন্‌ফিনে শ্বেত উত্তরীয়ের অন্তরাল হইতে সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট যজ্ঞোপবীতটি জ্বলজ্বল করিয়া আপন মহিমা বিকীরণ করিতে লাগিল।

সমান্তরালভাবে পুরাদমে শাস্ত্রাধ্যয়ন চলিয়াছে।

ছয়মাস পরে নবদ্বীপ হইতে গ্রামে ফিরিয়া কপিলেশ্বর ভট্টাচার্য বংশের বংশানুক্রমিক বাঁধা পরিক্রমায় আত্মসমর্পণ করিলেন। ব্রহ্ম-মুহূর্তে শয্যাত্যাগ, তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন, প্রাতস্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া বিভিন্ন যজমানবাড়ি গমন এবং ফিরিবার মুখে গ্রামের বারোয়ারী শীতলা পূজা করা—এই তাঁর দৈনন্দিন কর্মতালিকা। ডানহাতে উত্তরীয়ের তলায় বুকের কাছে নারায়ণ শিলা, আর বাঁ হাতে নৈবেদ্যের পুঁটুলি ও বগলে ঘোরানো-বাঁট প্রাচীন ছাতাটি লইয়া যখন তিনি প্রায় বেলা দুইটার সময় ক্লান্তভাবে ফিরিতে থাকেন তখন তাঁর ধূলিধূসর চেহারাটি বড় করুণ আর আধ্যাত্মিক দেখায়।

জীবন হইতে ক্রমে তাঁর সমস্ত উত্তেজনা উবিয়া যায়। তেলেজলে ও নিরামিষ আহার্যে পুষ্ট হইয়া দেহটি ধীরে ধীরে উত্তর দক্ষিণে বাড়িতে থাকে, আর উদরের পরিধির বর্ধিষ্ণুতার ফলে কাপড়ের ঝুল গিয়া ঠেকে হাঁটুতে। তাঁর অতল স্বচ্ছ চোখ দুটিতে আশ্চর্য এক আকর্ষণ,—যে কোন মানুষকেই চকিত দৃষ্টিপাতে শ্রদ্ধাবনত করে। সব সময়ই একটি প্রশান্ত হাসি মুখে লাগিয়াই আছে যেন। উদাত্ত স্বরে যখন তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করেন বা ধর্মের ব্যাখ্যা দেন তখন শ্রোতারা আকণ্ঠ বিস্ময়ে রুদ্ধবাক হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। সন্ধ্যাসরে চণ্ডীমণ্ডপে তাঁর নিকট হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম শুনিতে শুনিতে ব্রাহ্মণেতর পর্যন্ত গদ্‌গদ্ হইয়া গলিয়া যায়।

—বুঝলে ছিনাথ, ছিনাথ নন্দীর দিকে চাহিয়া কপিলেশ্বর বলেন, তোমার গিয়ে, ঐ খিরিস্তান ধম্মোই বল আর মোছলমানী ধম্মোই বল,—এই হিন্দু ধম্মের কাছে কিন্তু কিচ্ছুটি লাগেনা। হুঁ বাব্বা!

মন্ত্রমুগ্ধের মত ছিনাথ নন্দী ঘাড় নাড়িতে থাকে, সংগে সংগে বাকি সকলে অস্ফুট কণ্ঠে সমর্থন করে।

—বুঝলে হে, এই হিন্দু ধম্মো হচ্ছে মানস সরোবর তুল্য। তোমার গিয়ে, বাকি সব এর থেকে নদীনালা বেরিয়েচে।

কথাটা সম্ভবত ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই মনা ঘোষ। বলে, সেটা কী রকম হল ঠাউর মশয়?

নস্য ছাড়া কোনরূপ নেশা করেন না কপিলেশ্বর। বৃহৎ এক টিপ নস্য লইয়া তিনি কহিলেন, তোমার গিয়ে, যে ধম্মের যে কথাটি বলো, আমাদের মুনিঋষিরা আগে থেকেই সব লিখে রেখে গেছেন। দেখনা, কারুর ঈশ্বর এক আবার করুর ঈশ্বর অনেক। কিন্তু আমাদের মুনিঋষিরা এক ঈশ্বরের বিধেনও দিয়ে গেছেন আবার—কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন কপিলেশ্বর—তোমার গিয়ে, ভগবানতো পষ্টই বলেছেন, জবাকুসুম শঙ্কাসং কাস্যপেয়ং মহাদ্যূতিং—মানে, জবাফুলই বল আর কাশফুলই বল, আমার মহান দুতী, অর্থাৎ তোমার গিয়ে, ঈশ্বর-সেবিকা সবেতেই পেয়ং—অর্থাৎ কিনা পাবে—সাক্ষাৎ পাবে। কিহে চক্কোত্তি, বলনা ঠিক কিনা, অ্যাঁ?

কিন্তু কথা বলিবে কি চক্কোত্তি,—অন্য সবার মত ড্যাব ড্যাব করিয়া সেও শুধু চাহিয়া থাকে।

মাঝে মাঝে হাওয়া-বদল।

ঘরে সত্যকালি ঘোষ ঢুকিলেন। বগলের তলা হইতে দাবার ছকটি

ফরাসের এক পাশে নামাইয়া রাখিতে রাখিতে তিনি কহিলেন, না, এই ছেলে ছোকরার দল আর গায়ে তিষ্টুতে দেবেনা দেখচি। যত্তোসব—

—কেন, নতুন আবার কী করলে?

—এ্যাদ্দিন না হয় পুকুর বন সাফা করছিল মিনিমাগনা, মন্দের ভালো। সত্যকালি কহিলেন, এখন আবার গাঁয়ের সব চাষাভুষোকে এক-জোট করে ইস্কুল করচে, সমিতি গড়চে—এ সব কীরে বাবা? চাষা চাষ-বাস করে, ভদ্রলোকে লেখা পড়া শিখে চাকরী করে,—তাই তো জানি। কিন্তু এযে দেখচি কলির বিধেনই সব আলাদা। কী দরকারটা শুনি ছোট লোকদের লেখা পড়াটা শিখিয়ে? যত্তোসব—

—নারায়ণ! নারায়ণ! হাঁ করিয়া তুড়ি দেন কপিলেশ্বর। তারপর বলেন,—এইবার, তোমার গিয়ে, মেলেচ্ছ ভাব সব গায়ে ঢুকতে শুরু করেচে ঘোষজা। বিধেতার অভিসম্পাত নামল বলে।

—যত্তো নষ্টের গোড়া তোমার ঐ পরেশ ভৌমিকের নাতি, তাপস না কী যেন নাম। কলকেতায় কটা পাশ দিয়ে যেন—হুঁ। যত্তোসব—। তীব্র ঘৃণায় নিজের কথা আর শেষ না করিয়াই সত্যকালি কহিলেন—আবার বলে কী জানো? বলে, ওর ছোট বোনটাও নাকি বন্ধুনি-টন্ধুনি নিয়ে এই গরমের ছুটিতেই কলকেতা থেকে গাঁয়ে আসবে,—গাঁয়ের মেয়েদের নিয়েও নাকি একটা ইস্কুল মতন—যত্তোসব—।

—অ্যাঁ!! অনেকগুলি কণ্ঠের কলরব।

—নারায়ণ! নারায়ণ!

বছর গড়ায়।

কথাটা প্রথমে প্রকাশ করেন নাই নির্মলা। কিন্তু শেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বলিয়া ফেলিলেন, এই মাছুলিটা তুমি

পরতো গো।

—কেন শুনি ?

সে কথার উত্তর না দিয়া নির্মলা কহিলেন, আগেই যদি জানাতে তা'লে আর—ঝরঝর করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর ব্যাধি তাঁর মাতৃত্বকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

স্ত্রীর কথার অর্থ বুঝিলেন কপিলেশ্বর। গম্ভীর হইয়া কহিলেন, ওসব বাজে ব্যাপারে কেন মন খারাপ করো বলতো ? দেয়া নেয়ার কত্তা ভগবান, তুমি আমি ত নিমিত্ত মাত্র। তাঁর ইচ্ছে মেনে নিয়ে নকুলকে মানুষ করে তোল—ওই বংশের মুখ রাখবে।

এমনি করিয়া বছরের পর বছর গড়াইতে থাকে। ক্রমে দীর্ঘ পনেরোটি বছর।

এই সকল বছরের ইতিহাসে কাহিনী নাই, আছে কপিলেশ্বরের রূপান্তরের ধারাটুকু। কিন্তু সে আলোচনায়, আমি কাহিনীকার, আমার কী প্রয়োজন ? তবে, আজ জীবনের তৃতীয় ভাগে আগত কপিলেশ্বরকে দেখিয়া চিনিতে আমারো কষ্ট হয়। জীর্ণাণি বাসাংসির মত কপিলেশ্বর তাঁর অতীত জীবনের খোলস দূরে ফেলিয়া দিয়া একেবারে নতুন মানুষে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন যেন।

যদিও ইতিহাসে এটা মন্বন্তর লেখেনা, কিন্তু সে-বছর গ্রামটার উপর বৃষ্টিহীন রৌদ্রদগ্ধ আকাশটা যেন মহামারীর নিদারুণ অভিশাপ লইয়া ঝুলিয়া পড়িল। ঘরে ঘরে করুণাময়ী মা শীতলা দয়ার দানছত্র খুলিয়া দিলেন। প্রচুর ঢাকঢোল সহযোগে বারোয়ারী পূজা চলিতে লাগিল আর সমান্তরালভাবে গ্রামতলীর পুরাতন শ্মশানটা অনির্বাপিত শত শত

অগ্নিশিখার মধ্য দিয়া নতুন ভাবে জাগিয়া উঠিল।

ঈশ্বরের আর যে অপবাদই থাক, রোগ বিতরণে একদর্শীতা নাই সম্ভবত।

নকুলেশ্বরের শিয়রে বসিয়া অসহায় জননী নির্মলা শুধু নির্বাক চোখের জলে বুক ভাসান আর মূক আর্ত প্রার্থনায় জগন্মাতার নিকট সন্তানের জীবন ভিক্ষা করেন।

ঘরের মধ্যেই অশ্রান্তভাবে পায়চারী করিতেছেন কপিলেশ্বর। সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে কেমন যেন অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁর অমন রূপে-গুণে-বিদ্যায়-ব্যবহারে ইন্দ্রতুল্য যে পুত্র, যার দিকে তাকাইয়া তিনি ভবিষ্যতের কত সোনার স্বপ্নই না দেখিয়াছেন, আজ কোন বিধাতার অভিসম্পাতে তার এমন হইল? তার দিকে চাহিয়া চিনিবার পর্যন্ত যো নাই, মারী-গুটিকায় সর্বদেহ ছাইয়া গেছে।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নিজের উক্তিরই অনুবৃত্তি করিলেন নির্মলা। কহিলেন, কৈলাস ভটচাজকে ডেকেই না হয় বাড়িতে একটা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাও।

—তা হয় না গিন্নি। একই উত্তর দিলেন কপিলেশ্বর।

—কেন হয় না? মা'র চরণামৃতে সবার রোগ ভাল হয় আর আমার বাছার—নির্মলা তাঁর কথা শেষ করিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

—সবার ভালো হয়! ম্লান হাসিয়া কহিলেন কপিলেশ্বর, গ্রাম যে এদিকে উজাড় হতে চললো।

—দেয়া-নেয়ার ভার তো তাঁর ওপর। পুনরুক্তি করিলেন নির্মলা, কেন, তুমিই না মল্লিক বাড়ির স্বস্ত্যয়ন করে এলে? কই তাদের তো—

—তা বটে। যান্ত্রিক অভিব্যক্তিতে সায় দিলেন কপিলেশ্বর।

উচ্ছসিত হইয়া নির্মলা কহিয়া উঠিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, আর কিন্তু-টিন্তু কোরো না। মা'র ওপর অবিশ্বেস করে তুমি বাছার আমার অমংগল ডেকে এনো না।

—অবিশ্বাস! সহসা যেন আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া শ্রীকপিলেশ্বর ভট্টাচার্য গর্জিয়া উঠিলেন, কাকে কী বলচো তুমি? জানো, আজ ষোল বছর ধরে আমি ওই মা'র সেবাই করে আসচি? অবিশ্বাস! আমার? পাগল! কপিলেশ্বর একবার আত্মগত হাসিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই একটি কুশিতে খানিকটা চরণামৃত লইয়া আবার প্রবেশ করিলেন।

—সরে বসো।

সবটা ভিতরে গেলনা। গিলিবার শক্তি নাই। ঠোঁটের দু'পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িল। তীব্র যন্ত্রণায় নকুল একবার সমস্ত দেহটা মোচড় দিয়া বিকৃত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, মা!

—বাবা! সংগে সংগে পুত্রের মুখের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন নির্মলা। রোগের প্রকোপে গোটা মুখমণ্ডল তার ফুলিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। তার কপালের ওপর নিজের মুখ চাপিয়া ধরিলেন নির্মলা—মাতৃস্নেহের অমোঘ কবচে তিনি দুরন্ত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে চান। জননী হৃদয়ের অপরিসীম বেদনার অনুভূতি দিয়া নীলকণ্ঠের মত সন্তানের সকল যন্ত্রণাকে আত্মস্থ করিতে চান তিনি।

—মা'কে ডাক বাবা, তিনিই সব ভালো করে দেবেন।

কপিলেশ্বরের হাতটা একবার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হস্তস্থিত কুশিটা নিরালম্ব হইয়া ঠন্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

—দেখ, দেখ,—পায়ে ঠেকেনা যেন। উৎকণ্ঠায় নির্মলা প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

দৈনিক কর্মের বিরতি নাই। কয়েকটি যজমান বাড়ির কাজ সারিয়া কপিলেশ্বর যখন শীতলা তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানে পূর্ব হইতেই দরিদ্র গ্রামবাসীদের একটি ছোটখাটো ভিড় জমিয়া আছে।

—ব্যাপার কী সব? মন্দিরের নিচে চটি রাখিয়া দাওয়ায় উঠিয়া কপিলেস্বর প্রশ্ন করিলেন।

—মা'র চরণামৃত ঠাউর মশাই। সম্মিলিত আর্ত প্রার্থনা।

বিনা বাক্যব্যয়ে কপিলেশ্বর ধীর পদক্ষেপে পুরাতন মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। চিরজ্বলন্ত মুমূর্ষু প্রদীপের সলিতাটা খানিকটা উঁচাইয়া দিয়া প্রাত্যহিক পদ্ধতিতে উড়ানিঢাকা নারায়ণ শিলাটি পার্শ্বস্থ একটি জলচৌকির উপর স্থাপন করিলেন। মুখুজ্জেদের বালবিধবা মেয়েটিই এতকাল পূজার সমস্ত সরঞ্জাম আগে হইতে ঠিক করিয়া রাখিত। কিন্তু সম্প্রতি সে বাড়ির ছোকরা ঠাকুরটার সহিত গৃহত্যাগ করায় সে-ভারটা বর্তমানে কপিলেশ্বরের উপরই আসিয়া পড়িয়াছে। সব তিনি একে একে গুছাইয়া নিতে লাগিলেন।

সুদীর্ঘ ষোলবছরের দৈনন্দিন পরিক্রমার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু আজ একী ভাবান্তর তাঁর মধ্যে? বারবার মনটা এমন বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে কেন? আচমন করিতে ভুলিয়া গেলেন। মন্ত্রোচ্চারণে আর পূর্বের মত আবেগ আসিল না। ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উপবীতটি জড়াইয়া ধরিয়া নির্ণিমেষ তিনি চাহিয়া রহিলেন দেবীমূর্তির দিকে। আবছা আলোয় সে-মূর্তি অস্পষ্ট, কিছুই যেন স্পষ্ট ঠাওর হইতেছে না, বার বার শুধু মনে ভাসিতেছে মুমূর্ষু সন্তানের কাতর মুখের করুণ অভিব্যক্তি।

আশ্চর্য! কপিলেশ্বর একবার ভাবিলেন, এতদিন ধরিয়া তিনি পূজা করিয়া আসিতেছেন, অথচ আরাধ্যাদেবীর দিকে একবারও ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিবার সময় পান নাই। মনেও হয় নাই সেকথা। তাঁর কল্পনার মানস প্রতিমাও যেন কোথায় মিলাইয়া গেছে।

কর্তব্যের চাকায় বাঁধা জীবনে দিনের পর দিন আপনার বিশ্বাস, ভক্তি আর অনুভূতি দিয়া গড়া এক অশরীরি কল্পনাকে যেন দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু আজ কেমন করিয়া তা ভাঙিয়া চূরিয়া চূরমার হইয়া গেল।

সেই প্রায়ান্ধকার পরিবেশে, অদ্ভুত এক রহস্যময়তার আবেষ্টনীতে, চোখেমুখে এক নবতরো বিস্ময়ের ব্যঞ্জনা আনিয়া কপিলেশ্বর স্থাণুর মত বসিয়া রহিলেন। তাঁর সমস্ত দেহ বারবার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। দুই গাল বাহিয়া নামিল অশ্রুর ঢল। অস্ফুট প্রার্থনায় কয়েকবার শুধু 'মা' 'মা' বলিয়া তিনি দেবীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলেন।

হ্যাঁ, কপিলেশ্বর কাঁদিতে লাগিলেন!

প্রায় আধঘণ্টা। ক্রমে তাঁর বিমূঢ়তা কাটিয়া গিয়া আত্মসচেতনতা ফিরিয়া আসিল। চোখমুখ মুছিয়া বিত্রস্ত বেশবাস সংবৃত করিয়া নিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাতে তাঁর একটি বড় পাত্র ভর্তি চরণামৃত।

—একেক করে আয় সব।

জনতার মধ্যে প্রথমে ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল। তারপর সবাই পরপর চরণামৃত লইয়া চলিয়া গেল।

কপিলেশ্বরের পায়ের কাছে ইতস্তত ছড়ানো পয়সা আনি দুয়ানি,--কিন্তু সেদিকে যেন খেয়াল নাই তাঁর। নিশ্চল তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। জনতা চলিয়া গেছে—রিক্ত শূন্যতায় খাঁ খাঁ করিতেছে সামনের বিশাল চাতালটা।

অসহ্য গরমে কপিলেশ্বর ঘামিতে লাগিলেন।

—অমন করে দাঁড়িয়ে যে জ্যাঠামশাই।

চমকিয়া পথের দিকে চাহিয়া কপিলেশ্বর দেখিলেন তরুণ দাঁড়াইয়া কৌতুহল ভরে তাঁকে লক্ষ্য করিতেছে। তাপসের ছোট ভাই তরুণ। রাজদ্রোহের অপরাধে আজ দশবছর তাপস জেলে পচিতেছে, কিন্তু নিজের প্রতিভূ রাখিয়া গেছে কনিষ্ঠ সহোদরকে। এতটুকু তফাৎ নাই দুজনায়—না চেহারায় না কার্যে।

আমতা আমতা করিয়া কপিলেশ্বর কহিলেন, না না, এই, এমনি··· মানে, মনটা তেমন ভালো নেই কিনা। তা তুমি কোথায় যাচ্ছো বাবাজি?

—সর্ব্বেশ্বর কোবরেজের কাছে। ওদিকে নিতাই ঢোলের ছোট ছেলেটা আবার যায়-যায়। সহসা ব্যস্ত হইয়া উঠিল তরুণ, আচ্ছা, আমি এখন চলি জ্যাঠামশাই—

—কোবরেজের কাজে কেন বাবাজি? বিস্মিত হইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন।

—নাহলে আর কোথায় যাবো বলুন? গাঁয়েতো আর উনি ছাড়া ডাক্তার নেই। যিনি আছেন, তিনি ঐ সরকারী হাঁসপাতালের বড় ডাক্তার—ভিজিট দু'টাকা। রায় বা মল্লিকরা ওঁকে আনতে পারেন, কিন্তু গরীব চাষাভূষোর সে ক্ষমতা কোথায়? পথ্যিই জোটে না—

বাধা দিয়া কপিলেশ্বর কহিলেন, মল্লিকরা আবার সরকারী ডাক্তারও এনেছিল নাকি? কেন, আমিই ত স্বস্ত্যয়ন করে এলুম?

—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-মন্ত্র-চরণামৃতে কী আর রোগ সারে জ্যাঠামশাই? হাসিয়া কহিল তরুণ, ঠাকুরের ভরসায় থাকলে মল্লিকদের ছেলেটাকে

ঠাকুরই কোল দিতেন।

কপিলেশ্বরের মুখের উপর কে যেন সপাং করিয়া এক চাবুক মারিল।

তরুণ তখনো বলিয়া চলিয়াছে, ওঁরা হলেন বড়লোক। টাকা আছে, তাই ভগবানে বিশ্বাস রেখে পূজা-আর্চাও যেমন চালাতে পারেন তেমনি দরকার পড়লে আবার ডাক্তার ডাকতেও পারেন। কিন্তু যারা গরীব—ও কী! ছি ছি, আপনি কাঁদছেন জ্যাঠামশাই? নিদারুণ আত্মগ্লানিতে তরুণ সহসা বিব্রত হইয়া উঠিল, আপনাকে আঘাত দেব বলে ত আমি কিছু বলিনি। আপনি আমার বাবার বয়সী, না জেনে যদি কোন অপরাধ করে থাকি আমায় তা হলে ক্ষমা করুন। পায়ের ধুলা লইল তরুণ।

—না বাবা তা নয়। ধরা গলায় কপিলেশ্বর কহিলেন, আমি ভাবচি—। তিনি চুপ করিলেন।

তরুণ কহিল, আচ্ছা, আমি তাহলে এখন চলি জ্যাঠামশাই। একটু তাড়াতাড়ি আছে।

—যাবে? যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন কপিলেশ্বর, একটা কথা তোমায় বলতুম বাবাজি—

—বেশতো বলুন না। তরুণ আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

একটু ইতস্তত করিয়া ভাঙা ভাঙা কথায় কপিলেশ্বর আপনার বক্তব্য বলিলেন। মুহূর্তে তরুণের চোখমুখ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কহিল, এত ভাল কথা জ্যাঠামশাই। লজ্জা বা গোপনের এতে কি আছে?

—তুমি তা বুঝবে না বাবা, তুমি তা বুঝবে না। কপিলেশ্বরের চোখ আবার জলে ভরিয়া আসিল। তরুণের হাত দুটি ধরিয়া কহিলেন,

বুড়ো মানুষ, আমি তোমায় মিনতি করচি বাবা—দেখ, এটা যেন প্রকাশ না হয়।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া পুনরায় পায়ের ধুলা লইল তরুণ। কহিল, অমন করে কথা বলে আমায় আর অপরাধী করবেন না জ্যাঠামশাই। আমি তবে এখন আসি, কেমন?

—একটু শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর এসো কিন্তু। পিছন হইতে কপিলেশ্বর কহিলেন, তুমি না আসাতক আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

সত্যই তিনি চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, যতক্ষণ না তরুণ ফিরিল।

বেলা দ্বিপ্রহর। জ্বলন্ত সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহে চারিদিকের পৃথিবী যেন পুড়িয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। বসন্তের শেষ, কিন্তু গাছের শাখায় শাখায় সবুজের লেশমাত্র নাই। পথে লোকজন বিরল। উর্ধে শুধু দল বাঁধিয়া চিলের ঝাঁক উড়িতেছে। কোথায় যেন একটা সংগীহীন ঘুঘু ডাকিতেছে করুণ সুরে।

নিত্যকার মত ডান হাতে উত্তরীয়ের তলায় নারায়ণ শিলা, বাঁ হাতে নৈবেদ্যের পুঁটুলি ও বগলে ছাতা লইয়া কপিলেশ্বর চলিয়াছেন গৃহাভিমুখে। তবে আজ তাঁর গতিবেগ অত্যন্ত দ্রুত। সর্বাংগ দিয়া গড়াইতেছে শ্রান্তির স্বেদ।

বাড়ির কাছেই দত্তদের পুকুর হইতে বাহির হইয়া আসা একটা দীর্ঘ জলহীন নালার উপর এক জীর্ণ সাঁকো। প্রতিদিন এই সাঁকোটি তাঁকে অতিক্রম করিতে হয়। সাঁকোটায় ঘুণ ধরিয়া গেছে, পতনের সম্ভাবনা

প্রতিমুহূর্তে—তবু অবলীলায় সেটা অতিক্রম করিয়া যান তিনি। সাঁকোটার উপর পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে বেশ লাগে তাঁর।

আজ কিন্তু চরণের গতি শ্লথ করিয়া অতি সাবধানে তিনি সেটা অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

সহসা অদূর হইতে এক তীক্ষ্ণ তীব্র আর্ত আর্তনাদ ভাসিয়া আসিল।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন কপিলেশ্বর।

গলাটা নির্মলার।

চক্ষের পলকে যেন কী হইয়া গেল। গোটা দেহটা তাঁর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বগল হইতে ছাতাটি খসিয়া পড়িল, হাত হইতে নারায়ণশিলা, কিন্তু সেদিকে তাঁর হুঁশ নাই। একবার কান খাড়া করিয়া কি যেন অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিলেন।

ঘামে ভিজিয়া বাঁ হাতের মুঠোয় সর্বেশ্বর কবিরাজের ওষুধের পুরিয়াটা স্যাঁত স্যাঁত করিতেছে, এক দৃষ্টে তাহাই তিনি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্তরের অন্তস্থল হইতে কী একটা আবেগ প্রকাশের পথ পাইতেছে না—কপিলেশ্বরের ঠোঁট দুইটি শুধু নড়িতে লাগিল।

গলার স্বর জড়াইয়া যাইতেছে, নিঃশেষ হইয়া গেছে যেন দেহের সমস্ত শক্তি!

নির্মলার ক্রন্দন ক্রমে মর্মভেদী হইয়া ওঠে।

একটি পা বাড়াইলেন কপিলেশ্বর, কি একটা ঠেকিল। চাহিয়া দেখিলেন: একটি কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ড, আরেকটি পিতলের সিংহাসন!

অপর পা বাড়াইলেন তিনি।

পুকুরের অপর পারে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন: দত্তদের অতবড়ো চকমিলান অট্টালিকাটি ভাঙিয়া ভাঙিয়া ক্রমে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। তার বিরাট বনিয়াদের একেবারে তলায় যেন ঘুণ ধরিয়াছে, কিন্তু তবুও জীর্ণতার ফাটলে-ফাটলে গজাইয়া উঠিয়াছে কয়েকটি শিশু অশ্বত্থ।

সামনের হাজামজা পুকুরটায় তরুণের দল অসীম উল্লাসে পংক উদ্ধারের কার্যে লাগিয়া গেছে। খর মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যালো তাদের উচ্ছসিত সিক্ত পেশীর উপর পড়িয়া চিক চিক করিতেছে।

চোখে অযুত বিস্ময় আনিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন কপিলেশ্বর। তাবপর শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে।

চৈত্র
১৩৪৯

কোনো উপন্যাসের উপসংহার

(মহেন্দ্রনাথ-কে)

বোবা হইলে কি হয় মহামায়া কথা কয় মনে মনে। অজস্র অনর্গল এবং অসংলগ্ন সব কথার স্তূপ মহামায়া রোমন্থন করে অবিরাম অবিশ্রাম।

কিন্তু চার বছরের শিশুর আর কত সয়? চিৎকার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে মা'র বুকে মুখ গোঁজে আর মাই টানে। দুধ পায়না এক ফোঁটা, তাই হয়তো কাঁদে চিঁ চিঁ করিয়া। সমস্ত কিছু ভুলিয়া মহামায়াকে তখন ক্ষুধার্ত সন্তানের সারা শরীরে হাত বুলাইয়া শান্ত করিতেই হয়।

লোক দেখিলেই মহামায়া ছেলেকে আবার টিপিয়া দেয় কিন্তু। কোটরাগত চোখ দুটি তুলিয়া তাকায় তার ছেলে। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো শুরু করে, অনাথা বালককে একটা টেরামের কুপন দাও গো বাবা। তোমরা না দিলে কে দিবে গো? নইলে যে না খেতে পেয়ে মরে যাই গো। বাবাগো! অনাথা বালককে—

প্রথম প্রথম ঘোমটার আড়ালেও শেষ কথাটা শুনিয়া মহামায়ার বুকটা একবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত। শ্রীধর বাঁচিয়া নাই,—একথা মা চণ্ডী মুখ ফুটিয়া বলিলেও ও যেন বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু আজকাল অনেকটা সহিয়া গেছে। এখন আর ঘোমটার আড়ালে ওর বুক ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠেনা। বরং আধা ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ দুইটাকে যথাসম্ভব করুণ করিয়া পিট পিট চায়।

•

সকাল নটা হইতে বেলা দশটা পর্যন্ত খুব একচোট ভিড়ের মহড়া চলে। কিন্তু আদায়পত্তর এসময় বড় একটা হয় না। পান চিবাইতে চিবাইতে টিফিনের কৌটা হাতে আপিসের বাবুরা যা হন্তদন্ত থাকেন! এক মিনিট দেরী হইলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইবে। কাহারো দিকে ফিরিয়া চাহিবার সময় নাই—এমন তাড়া। পয়সা চাহিবে কি,

ফুটবোর্ডে অথবা র‍্যামপার্টে ঝুলন্ত বাবুদের দেখিয়া তখন ভারি মায়া হয় মহামায়ার।

তবু এ-আর-পি আশ্রয়গৃহটি ছাড়িয়া এসময় একবার নিত্য হাজিরা দেয়া চা-ই তার। দৈবাৎ যে কিছু মেলেনা তা নয়—তবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে মাথা তোলা রীতিমত শক্ত। পেশাদারী ভিক্ষুকরা বিকলাংগ হইলে কি হয়, গলা যেন তাদের আকাশ ফাটায়। উহাদের সাথে তো আর এক হইতে পারে না মহামায়া? গ্রহের বিপাকে আজ নাহয় তাকে ভিক্ষাই করিতে হইতেছে, তাই বলিয়া হৈম, নিস্তারিণী, কালিতারার মতো নির্লজ্জ হইতে হইবে নাকি? সে দিন তো হৈম ফর্সা কাপড় পরা এক বাবুর জামা ধরিয়াই টান মারিল। মাগো! যাই বলো বাপু, মহামায়া কিন্তু অতটা পারিবে না।

আর মানদা? মানদার সেদিন সেই গৃহিণীটির পায়ে অমন করিয়া লুটাইয়া পড়াটা কিন্তু ভারি হ্যাংলামির পরিচায়ক হইয়াছে। গংগাস্নান সারিয়া ফিরিতেছিলেন তিনি, কেমন কাটা-কাটা কথা শোনাইয়া দিলেন। ছিঃ! ছিঃ!

বেরাচাঁপা গাঁয়ের বটকেষ্ট মণ্ডলের নাতবৌ, শ্রীধর মণ্ডলের ঘরণী সে,—আজ কলিকাতার ফুটপাথে দাঁড়াইয়াও একথা ও ভুলিতে পারেনা কিছুতেই।

কে যেন একটা চকচকে ডবল পয়সা দিয়াছে। পয়সাটা হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া মহামায়ার ছেলের সে কী খুশিখুশি ভাব। মুখে হাসি আর ধরে না। বার বার নিজে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, মা'কে দেখায়। তারপর আশে পাশে সন্ধানী চোখ ছুঁড়িয়া চায়—কেউ দেখিতেছে কি না।

তেলেভাজার দোকানের কাছে আসিয়া মহামায়া ছেলের কাছে

পয়সা চায়,—কিন্তু ছেলে তার পয়সা দিবেনা কিছুতেই। মুখ ফুটিয়া চাহিতে পারেনা, আবার জোর করিতেও প্রাণে সয়না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া দোকানের দিকে পিছন ফিরে সে। কিন্তু ছেলেও আবার ফিরিয়া ফিরিয়া দোকানের দিকে লোলুপ চোখে চাহিতে থাকে। সহসা যেন হুঁস হয় তার। আপনা হইতেই পয়সাটা ছুঁড়িয়া দেয় দোকানীর কাছে।

দুপয়সার মুড়ি বিক্রি হয় না! আরে, বলে কি দোকানীটা? বোবা মহামায়া অগাধ বিস্ময়ে যেন নির্বোধ হইয়া যায়। দুইটা পয়সা কি পয়সা নয়? খোলামকুচি? না, মুড়ির দর জানেনা মহামায়া? গাঁয়ে থাকিতে উঠোনের বড় উনোনটায় ভাজিত না সে মুড়ি?

দোকানীর সম্ভবত দয়ার শরীর। কয়েকমুঠা মুড়ি মহামায়ার আঁচলে সে দেয় অবশেষে। কিন্তু তা দেখিয়া ও আবার গোঁ গোঁ করিতে থাকে। দু' পয়সার মুড়ি নাকি এ-ই?

যাই হক, মুড়ি লইয়া মহামায়া আপনার স্থানে ফিরিয়া আসে। তাহারো প্রচণ্ড ক্ষুধা পাইয়াছে। কিন্তু এই কটি মুড়ির সেই বা খাইবে কি, আর ছেলেকেই বা কি দিবে?

পাছে শিগ্‌গীর ফুরাইয়া যায় তাই দুটি দুটি করিয়া ছেলেকে খাওয়াইতে থাকে। তার ছেলে যেন সমস্ত শরীর দিয়া গিলিতেছে, এমন অংগভংগি করে। তা দেখিতে দেখিতে মহামায়ার শ্রীধরের কথা মনে পড়ে—মুখখানা যেন একেবারে তারি ছাঁচে তোলা। গভীর আবেশে ছেলের মাথায় কয়েকটা চুমা খায় মহামায়া।

খর দুপুরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে। পথঘাট সব যায় নিস্তব্ধ হইয়া। অসহ্য গরমে চারিদিক করে থমথম। মাঝে মাঝে দু' একটা গাড়ি

হুস করিয়া চলিয়া যায়। দু' একটি পথিক হাঁটে ঘাড় নিচু করিয়া।

এ সময় দেশ-গাঁয়ে ঘুঘু ডাকিত। এখানে হাঁকে ফিরিওয়ালা। কোনো তফাৎ নাই যেন। কি সুন্দর সুর করিয়া বলিতে থাকে—'হেজ্‌লিন পমেটম্ পাউডার চাই, চুল বাঁধার ফিতে চাই, সিন্দুর কাঁটা চুড়ি চাই—'। আরো কতো কী। কতদিন ইচ্ছা হইয়াছে তার ডাকিয়া দুদণ্ড কথা কয় ওর সংগে। বয়স কতই বা হইবে, তার মরা ভাইটা বাঁচিয়া থাকিলে এরি মতো হইত হয়তো। কিন্তু ছেলেটা যেন কী! কি বিশ্রী তার চাউনি। কেমন আড়চোখে চুরি করিয়া তাকায় অসভ্যের মতো!

আজ একটা ফিরিওলারও দেখা নাই।

ছেলের সারা শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে গোঁ গোঁ শব্দ করে মহামায়া। সন্তান-স্নেহ প্রকাশের এই তার প্রক্রিয়া। একেবারে বুকের সংগে কুকুর ছানার মত নেতাইয়া আছে বাচ্চাটা। ঘামে ভিজিয়া গোটা শরীর তার আম্‌সীর মতো স্যাঁৎস্যাঁৎ করিতেছে। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আঁচল দিয়া ছেলেকে আল্‌গোছে মুছাইয়া দেয়। জাগিয়া উঠিলে এখুনি তো আবার খাইতে চাহিবে। ওর যত ভয় সেইখানেই।

রাস্তার পিচগুলা গলিয়া গিয়া কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ বাহির হইয়াছে। একান্ত তন্ময় হইয়া অপরিচিতের মতো মহামায়া তার ঘ্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছিল—সহসা অনেকগুলি কণ্ঠের কলরবে পাশ ফিরিয়া চাহিল। জন আষ্টেক সর্ববয়সের পুরুষ নারীর একটা দল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সতীর মা খাড়া হইয়াছে তাদের মুখোমুখী।

প্রথম আলাপটা অবিশ্যি শুরু হইল ভালোভাবেই। প্রচুর সমবেদনার সহিত। একটি সমগ্র পরিবার ওরা। মহামায়া দেখিতে লাগিল—ঐটি নিশ্চয় কর্তা, এইটি গিন্নি। আর ইহারা ছেলেমেয়ে কিম্বা

ছেলের বউ হইবে হয়তো। কর্তাটির হাতে একটি পুঁটুলি—কিন্তু কী চেহারা তার! নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে বুকের পাঁজরগুলা ওঠানামা করে। আর সকলের হাতে একটি করিয়া টিনের থালা কিম্বা বাটি।

—কোথেকে আসচো গো?

—গাঁয়ের নাম বলবুনি। কর্তাটি বলিল।

তাচ্ছিল্যের স্বরে সতীর মা কহিল, নেই বললে। বলি, তা' এ্যাদ্দিন ছিলে কোন্ চুলোয়?

সতীর মা'র মুখে বড়ো বিষ। একটু ভালো করিয়া কথা কহিতেও নাই? মায়া হয়না ইহাদের দেখিয়া? বোবা মহামায়া চোখ দিয়া প্রচুর সমবেদনা উপচাইয়া দিল।

—হাবড়ার পুল জান? সেথায় ছিনু গো আমরা। গিন্নি বলিল।

—তা এলে কেন?

—এনু কী সাধে। ওখেনে সব মানুষ-ধরার অত্যেচার শুরু হল যে। জোর করে ধরে নিয়ে গাড়ি-গাড়ি চালান দিতে নাগলো। তাই না প্লাইলে এনু। মরি তো একসাথেই সব—

তাকে ধমক দিয়া কর্তা বলিল, তুই থাম দিকিন বড় বউ। এজেহার দিতে হবে নাকি হেথাহোথা। শোন মেয়ে, আমরা এখেনে থাকবো।

—হবেনা। সোজা হইয়া এ-আর-পি আশ্রয়গৃহটির প্রবেশপথ ঘেরিয়া দাঁড়ায় সতীর মা।

—ব্যস্। সাফ্ কথা। চলে আয় সব। গট-গট করিয়া কর্তাটি পুঁটুলি তুলিয়া আবার হাঁটা দিল।

—রোথ্ তবু গেলনা মিন্ষের। পিছন পিছন যাইতে যাইতে গজ গজ করে তার পরিবার, এটা কী গেরাম নাকি যে মোড়লি চলবে?

মহামায়া তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে উহারা চলিয়া যাইতেছে। পিছন হইতে মনে হয় অনেকগুলি মানুষের কংকাল যেন হাঁটিতেছে—একটি সমগ্র পরিবার! খালি পায়ে গলিত পিচের পথে বড় কষ্ট হইতেছে ছোট ছেলেটার—লাফাইয়া লাফাইয়া হাঁটিতেছে সে। তার মা-টা যেন কী! নিজের ঘোঁমটা লইয়াই অস্থির।

কিছুক্ষণ সেইদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সতীর মা বলিল, বাব্বা, দেমাক এখনো ষোলো আনা। স্বগতই সে বলে, নিজের গোঁয়ে যেখেনে যাবি যা না—বাকিগুলোকে আর কষ্ট না দিলে না? কেন, জোর করে থাকতে পারতিস নে হেথায়? একী আমার বাপকেলে ঘর?

তারপর মহামায়ার দিকে চাহিয়া বলে, ভিত্‌রে যেয়ে বস লো মায়া, ছেলের গায়ে রোদ লাগে।

বাহিরের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল মহামায়া।

বিকাল হইবে, তার পূর্বাহ্ণেই যেন এখানে একটা নোটিশ আসিয়া যায়।

ঘরের মধ্যবর্তী প্রায়ান্ধকার স্থানটায় সারাদিন মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকে গংগাপদ। কথাবার্তা সে কাহারো সহিত বড় একটা কয়না। সব সময় মনমরা ভাব তার। আগে মাঝে মাঝে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিত—পরিবার তার হারাইয়া গেছে কন্ট্রোলের ভিড়ে। গ্রাম হইতে স্বামী-স্ত্রিতে, ভিক্ষা নয়, চাল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু একদিন ফিরিবার সময় নির্দিষ্টস্থানে গিয়া পরিবারের পাত্তা পায় নাই গংগাপদ। চাল নিয়াও গাঁয়ে আর ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই তার। কয়েকদিন টো টো করিয়া ঘুরিয়াছে সারা শহর পরিবারের খোঁজে। দেখা পায় নাই। আজকাল সে এখানেই থাকে। দিনের বেলা বাহির হয়না। বয়সটা

তার যোয়ান কিনা—হাত পাতিলেই সকলে দূর-দূর ছাই-ছাই করে যে।

গংগাপদ উঠিয়া একবার বাহিরটা উঁকি মারিয়া দেখিয়া লইল। না, এখনো অনেক রোদ।

অতবড়ো যোয়ান মদ্দটার এই রকম মিন্‌মিনে ভাব কিন্তু মহামায়ার একটুও ভালো লাগে না। বেটাছেলে বেটাছেলের মতো না হইলে মানায় নাকি?

তার মনে পড়ে শ্রীধরের কথা। ফসলের দিনে একেবারে দুপুর গড়াইয়া শ্রীধর ক্ষেত হইতে ফিরিত ঘামে স্নান করিয়া। চৌকাঠে পা দিয়াই মানুষটার কী মেজাজ—তার পিসশ্বাশুড়ী পর্যন্ত ভয়ে কাঠ হইয়া যাইত। কিন্তু সে নিজে কিন্তু একটুও ভয় পাইত না—আসলে তার ভালোই লাগিত। শ্রীধরের রাগারাগি চেঁচামেচি শুনিলে তার আড়ালে যাইতে ইচ্ছা করিত না, ইচ্ছা করিত দু'দণ্ড বসিয়া পাখা দিয়া বাতাস করিয়া একটু আরাম দেয় ওকে। আহা, সারাদিন বড় খাটনিটা খাটিয়াছে সে।

আধখানা ঘোমটা দিয়া তেলের বাটিটা আগাইয়া দিতে গিয়া সে হয়তো ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিত।

—হাসিস্ যে বড়?

উত্তর না দিয়াই হয়তো ফিরিয়া গেল মহামায়া।

উত্তর না পাইয়া দ্বিগুণ চিৎকারে শ্রীধর শুধাইত, কি, উত্তর দিলি নে যে? বলি, আমারে দেখে এত হাঁসি কিসের, অ্যাঁ?

মহামায়ার হাস যেন ইহাতে আরো বাড়িত।

—বটে! তা হাস, হাস, প্রাণ ভরে হাস। হেসে-হেসে দম আটকে যা—। নিজের মনেই গজগজ করিতে করিতে গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া ডোবায় ডুব দিতে উঠিয়া যাইত শ্রীধর।

খাইতে বসিয়া ভাতগুলা গিলিত সে গোগ্রাসে—যেন বাহির হইতে কইমুদ্দি গাড়োয়ান তাগাদা দিতেছে বেলেডাংগার হাটে যাইবার জন্য।

পিসশ্বাশুড়ী এ সময় কাছে আসিয়া বসিত।

—একটু ধীরে সুস্থে খা না বাছা। টাগরায় লেগে শেষকালে একটা যাতা কাণ্ড করে বসবি।

অমায়িক হাসিত শ্রীধর।

—বেলাবেলি যেতে হবে পিসি। হাটখোলায় যাত্রাগান আছে। কলকেতার মস্ত বড় দল।

—থাক। যাত্রা তোর ফুরোচ্ছে না।

—কিন্তু যায়গা যে ফুইরে যাবেগো পিসি।

তারপর মহামায়াকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিত, বুঝলি পিসি, অনাবিষ্টি হলেও এবার ক্ষেতের আর কিচ্ছুটি হবেনা। যা ফসল হয়েচে,—যাসনা একদিন তোরা। দেখলে যেন চোখ জুইড়ে যায়।

—সবই মা চণ্ডীর কের্পা বাবা।

—তা লাখ কথার এক। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া শ্রীধর বলিল, সব পাওনাগণ্ডা বকেয়া মিটিয়েও এবার বাঁচবে বোধ করি তিন কুড়ি ট্যাকা। ভাবচি হরিহরের বলদজোড়া কিনে নোব—ও-ও বেচবে বেচবে বলছিল। চাষবাস ছেড়ে ও কলে কাজ নেবে কিনা। তারপর একটু থামিয়া কয়েকগ্রাস গিলিয়া, রূপোর যা দাম শুনি—বাব্বা !.

হেঁসেল হইতেই শুনিত সব মহামায়া। ঠোঁট উল্টাইত সে। ইস্! রূপার বাজুর জন্য তার যেন ঘুম হইতেছে না! কিন্তুক না ও হরিহর ঠাকুরপো'র বলদজোড়া—ক্ষেত আর লাঙলই তো লক্ষ্মী।

কান্নার শব্দে মহামায়ার চমক ভাঙিল। বিন্দি আলুথালু অবস্থায়

চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। তার ভাইটা নাকি কোন্ গাড়ির তলে পড়িয়া একেবারে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে—সংবাদ আনিয়াছে হারাণ। সে নিজেই দেখিয়া আসিয়াছে কিনা। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সে তার খোঁড়া পা লইয়া ঢুকিতে পারে নাই।

বিন্দি প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলে হারাণকে।

—তুমি দেখলে? সত্যি তুমি দেখলে? দেখলে ভাইটা আমার মরে গেছে?

—তা দেখনু বই কী। চোখমুখ যথাসম্ভব করুণ করিয়া হারাণ বলিল, ভিক্কের তরে সারা শহর টহল দিতে হয় না মোরে? দেখনু উ-ই চৌরাস্তার মোড়ে—

বিন্দি আবার চিৎকার করিয়া আছড়াইয়া পড়িল।

ভাই-বোনে তাদের বড় ভাব ছিল। পোয়াতি পরিবারকে ফেলিয়া বিন্দির স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়াছিল—কিন্তু কুড়ি বছরের ভাই বিশুই তার ভার লয়।

—নিজের মায়ের পেটের বুন, ওটারে তো আর ফেলে দিতে পারিনে এই অবস্থায়, বলো তোমরা? যাই বলো, আমার ভগ্নিপোত কাজটা কিন্তুক ভালো করলো না। ঈশ্বর আছেন—

এই সব কথা বলিত বিশু আর সারাদিন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যা সংগ্রহ করিয়া আনিত, ভাইবোনে তাই ভাগ করিয়া খাইত।

—তুই এট্টু বেশী করে খা বিন্দি। শরীলের যত্ন আত্তি নে এট্টু। আমার এতেই চলবে। পথে ঘাটে কত কী খাই আমরা—

—তা আর জানিনে। তোমার তরে রাস্তার লোকেরা সব পোলাও কালিয়া বিলুচ্ছে যে!

—এ্যাই দেখ অবিশ্বেস। রাগ করিয়া বিশু বলিত, আমি তোর

বড় ভাই, গুরুজন না? মিথ্যে কইচি নাকি?

খাওয়ার পরে অনেকটা জল ঢোঁক ঢোঁক করিয়া গিলিয়া টান হইয়া পড়িত বিশু, কী মশারে হেথায়। আয় তো রে দিদি। চুলগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে দে। মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করে য্যান।

বিন্দি যাইয়া দাদার শিয়রে বসিত।

এতগুলি লোকের কাহারো সহিত ওরা কথা বড় একটা কহিত না। দুই ভাই-বোনেই যেন সব। ইহার জন্য অন্য সকলে অবিশ্যি কথা শুনাইতেও ছাড়িত না। ঈর্ষায় হয়তো।

বিন্দিকে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানা প্রবোধ দিতে লাগিল। মহামায়ার ইচ্ছা হইল সেও যায় একবার। কিন্তু কী করিবে গিয়া? সে ত আর উহাদের মতো কথা কহিতে পারিবে না বিনাইয়া বিনাইয়া।

—তুই যদি তারে শেষ দেখা দেখতে চাস তো, নে যেতে পারি।

নিজের অমন বাপের মতন ভাইকে শেষ একবার দেখিবে না বিন্দি? নিশ্চয়ই দেখিবে। তার সামনে দাঁড়াইয়া একবার ভগবানকে শুধাইবে—কি অপরাধে তিনি তাকে এমন শাস্তি দিলেন? তারা দুই-জনে জ্ঞানত কোনো পাপই তো করে নাই? সবই তো গিয়াছে তার, এই শেষ সম্বলটুকু—

বিন্দি আবার কাঁদিতে লাগিল।

মহামায়ারো চোখে জল আসিয়াছিল। উঠিয়া গিয়া সে বাহিরে দাঁড়াইল। সহসা চোখ মুছিয়া চাহিতেই তার লক্ষ্য পড়িল দূরে বিশু আসিতেছে।

বিশু আসিতেছে—বিশু! বিশু!

সে তাহা হইলে বাঁচিয়া আছে?

আনন্দে গোঁ গোঁ করিতে থাকে মহামায়া। হারাণও বাহির হইয়া যাইতেছিল—হঠাৎ অদূরে বিশুকে আসিতে দেখিয়া চোরের মতো সে উল্টা দিক দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দৌড় দিল।

তার দিকে চাহিয়া ভারি বিস্ময় বোধ হইল মহামায়ার। কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় নাই। যে মহামায়া কোনোদিন বিশুর সহিত কথা কহে নাই পর্যন্ত সে-ই দু'হাত তুলিয়া বিশুকে ডাকিতে লাগিল। বোবা না হইলে হয়তো চিৎকার করিত।

বিকাল হইতে না হইতেই শহর যেন আবার জাগিয়া ওঠে। গাড়ি ঘোড়ার শব্দ আর লোকজনের চিৎকারে সমস্ত দিক যেন গমগম করে। সরকারী লোকেরা গামছা পরিয়া রাস্তার গর্ত হইতে নলে করিয়া জল তুলিয়া পথঘাট সব ভিজাইয়া দেয়। রোদ পড়িতে না পড়িতে সাজিয়া গুজিয়া ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা ঝি চাকরের সংগে বেড়াইতে বাহির হয়। বরফওয়ালারা সুর করিয়া হাঁকে। বড়লোকদের আইবুড়ো ছেলেমেয়েরা খোলা মোটরগাড়িতে করিয়া যাইতে যাইতে হাসিয়া হাসিয়া এ ওর গায়ে পড়ে, বেলেল্লাগিরি করে। সকালের বাবুরা বাসে ফেরেন, নামেন। তাদের ঘিরিয়া জমে জটলা।

এ-আর-পি আশ্রয়গৃহ খালি করিয়া প্রায় সকলেই আসিয়া দাঁড়াইল বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে। ছেলে কোলে নিয়া মহামায়াও। নানা সুরে, নানা ভংগিতে, নানা কথায় সকলেই চিৎকার করিয়া ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। মহামায়ার ছেলেরও কামাই নাই। সত্ত ঘুম ভাঙিয়াছে বলিয়া কথাগুলি প্রথম প্রথম তার জড়াইয়া যাইতেছিল। কিন্তু তার মা তাকে বারদুই তীব্র ঝাঁকুনি দিতেই সে সচেতন হইয়া উঠিল।—অনাথা বালককে

একটু দয়া করুন গো। তোমরা না দিলে কে দিবে গো? নইলে যে না খেতে পেয়ে মরে যাই গো। বাবাগো! অনাথা বালককে—

কেউ কেউ দুএকটা পয়সা ছুঁড়িয়া দেয় নিঃশব্দে, কেউ সশব্দে কয়েকটা ধমক দেয় মাত্র। এবং কেউবা উচ্চৈস্বরে জানায় শুধু সমবেদনা।—

—আহা! সত্যি, এদের দেখলেও দুঃখু হয়। তাকানো যায় না এদের দিকে।

—উপায় কী বলুন? প্রাণে ধরে যে একটা আধলা দেব, তাওতো পারিনে। এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে নিজেদের হালই—

—আরে মশাই, দু'চার পয়সা ভিক্ষে দিয়েই বা কি হবে? ভিক্ষেয় কখনো অভাব ঘোচে? সেদিনে পড়েছিলেন স্টেট্‌স্‌ম্যানের প্রবন্ধটা? কেমন চুটিয়ে লিখেছে—দিস্ ইজ্ এ ম্যান্-মেড ফেমিন্!

—বিলেতে এরকম হ'লে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো একবার ভাবতে পারেন?

—ভয় নেই, বিলেতে এরকম হতোই না।

—পরাধীন দেশ কিনা স্যার, মানুষগুলো একেবারে কুকুরেরো অধম। বুঝ্‌তাল্লেন, না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরবে তবু জোর করবে না, দাবি জানাবে না।

—যা বলেছেন। কিন্তু, (নীচু গলায়) এ শালার চাল আর বেশী দিন নয়। গেল ডিসেম্বরেই মালুম দিয়েচে।

—নারায়ণ! নারায়ণ! দাঁড়ানো অবস্থাতেই কোনোক্রমে তুড়ি দেন জনৈক বৃদ্ধ।—কলিকাল তো আর আকাশ থেকে পড়েনা ভায়া। ষোলো কলা পাপ পূর্ণ হলেই না—হুঁ। চেতাবনী তো পষ্টোই লিখছে—

সহসা বাস ষ্টার্ট দেয়। তাঁর উক্তি তিনি শেষ করিতে পারেন

না। আচম্‌কা এক ফিরিংগির গায়ে পড়িয়া গুঁতা খান।

আজ দিনটা ভালই বলিতে হইবে। সকাল বেলা দু' পয়সা, আর এ বেলা দশ। হে মা চণ্ডী!

সন্ধ্যার সংগে সংগে নগরীর রূপ বদলায়। কিন্তু মহামায়ার বড় নির্জন লাগে। বড় নিঃসংগ মনে হয়। মনে পড়ে শ্রীধরের কথা।

সন্ধ্যা হইলেই শ্রীধরের মুখে যেন খই ফুটিত। দাওয়ায় বসিয়া কেবলি বক বক করিত—যে আসিত তারি সংগে। সেসব কথার কোনো মাথামুণ্ড ছিল নাকি? বাবাঃ, কি বকিতেই না পারিত! তবু হেঁসেল হইতে কান খাড়া করিয়া থাকিত মহামায়া—নিজে ত সে আর কথা কহিতে পারিতনা, তাই স্বামীর কথার সুর তার কানে ভারি মিষ্টি লাগিত।

মাঝে মাঝে শ্রীধর অবিশ্যি তাকে ফেলিয়া, তেলচকচকে করিয়া টেরী বাগাইয়া, ফর্সা পিরান গায়ে দিয়া হাটখোলায় চলিয়া যাইত যাত্রা শুনিতে। মহামায়াকেও সংগে লইতে চাহিত, কিন্তু ঘরের বউ মহামায়া তো আর হুট বলিতে বাহির হইতে পারে না?

এই তো সেবার শেষ রাতে ঢুলু ঢুলু চোখে যাত্রা শুনিয়া ফিরিয়া যা কাণ্ড করিয়াছিল শ্রীধর—ভাবিলে মহামায়ার শরীর শিহরিয়া ওঠে। হঠাৎ তার গলা জড়াইয়া 'পানেশ্বরী' আরো যেন কি সব বলিয়াছিল এ্যাক্টোর মতন। মহামায়া তো থ! না, শ্রীধরের মুখে কোনো গন্ধ নাই। তবে?

শ্রীধর নাকি যাত্রার রাজপুত্তুরকে এই রকম সব কথা বলিতে শুনিয়াছে রাজকন্যাকে। তাই নাকি? মাইরী! রাজকন্যাকে যা

মাইনেছিল! হুঁ, তা বাকি রাতটা সেখানে কাটাইয়া আসিলেই চলিত? ইস্! আমার রাজকন্তের যে দেখি বড় মান হলো? না, মান হইবে না! একাএকা সারা রাত—। কিন্তু তার কথা শেষ করিতে দেয় নাই শ্রীধর—অসভ্যের মতো তার সংগে কিছুক্ষণ খুনসুটি করিয়া কামিজের পকেট হইতে বাহির করিয়াছিল চকচকে দুইটা রূপার বাজু!

মহামায়া নিজের রিক্ত বাহুদুটির উপর একবার আলগোছে চোখ বুলায়। মনি স্যাকরা কি আজো গ্রামে আছে?

—বলি ও বড়মান্ষের বেটি?

চমকিয়া পাশ ফিরিয়া চায় মহামায়া। খিলখিল করিয়া হাসিতেছে কালিতারা। হাতে তার রঙিন কাচের চুরি, পরণে নতুন লালপাড় শাড়ি, ঠোঁটে পান।

কী হাসির ঢঙ! কালিতারাকে দেখিলেই মহামায়ার সমস্ত শরীরে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়। ও মরেনা কেন? এই সেদিন যে নিজের সদ্যপ্রসূত সন্তানকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল, আজ সে দাঁত বাহির করিয়া হাসে কোন্ লজ্জায়?

—আজও সে এয়েছিল লো। আমারে এগুলো দিয়ে গেল। হাতের চুরির গোছা দেখায় কালিতারা। আর সেই হাসি।

মহামায়ার গোটা শরীর যেন রী রী করিয়া ওঠে। সেই লুঙিপরা লোকটার সাথে কালিতারা তা হইলে সত্যসত্যই—

—আজও সেধে গেল কত করে। হাসিয়া বলে কালিতারা, তোর ছেলেটারে চায় সে। তিন ট্যাকা তক রাজি, দিবি নাকি লা?

ষাট! ষাট! সন্তানের মাথায় ফুঁ দিয়া মা মহামায়া তার মংগল

কামনা করে। জ্বলন্ত চোখে তাকায় কালিতারার দিকে।

কালিতারা বলে, নিজে তো মরবি, ছেলেটারেও শেষ করে যাবি। আমারো না ছিল একটা? কালিতারা হাসিয়াই খুন।

ছেলে কোলে লইয়া উঠিয়া পড়ে মহামায়া। এই বেবুশ্যে মাগিটার ছায়া মাড়ানোও পাপ। কথা বলিবার শক্তি থাকিলে শুনাইয়া দিত সে একচোট।

পিছন হইতে চেঁচাইয়া বলে কালিতারা, আমার বাস তো উঠলো হেথা হতে। আজ সন্ধেয় চললুম মাঠকোঠায়।

চুলোও যাও। মহামায়া থুথু ছিটায়।

রাতটা কোনমতে আধাঘুমে কাটিয়া যায়। ভোর হইতে না হইতেই আবার সকলের মধ্যে দিনের জন্য প্রস্তুতির সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই যেন এই সকালটির উন্মুখ প্রতীক্ষায় থাকে। আজকের দিনেই যেন তাদের জীবনের যা-কিছু-একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইবে।

শুধু ম্লান মুখে রাত্রির টহল সারিয়া ফেরে গংগাপদ।

ভোরবেলাটা মহামায়ার খুব ভালো লাগে। এখানে অনেক বেলা না হইলে সূর্য দেখা যায় না—কিন্তু বেরাচাঁপায় দেখা যাইত। রাত শেষ হইতে না হইতেই তার কাজ পড়িত। ভোর বেলায় ঘুমন্ত স্বামী ও সন্তানকে ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করে নাকি কাহারো? তবু তাকে উঠিতেই হইত। ঘুমন্ত শ্রীধরের আর সন্তানের দিকে একবার পরিপূর্ণ ভাবে চোখ মেলিয়া সে বাহির হইয়া যাইত। তারপর শুরু হইত ঝাঁট, গোবরজল ছড়ানো, বাসিপাট সারা, জাবর দেয়া, কাপড় কাচা, ক্ষেতে যাইবার আগেই শ্রীধরের পান্তা ভাত ও নুন ঠিক করিয়া রাখা—কত কী। ত্যাখত্যাখ করিতে করিতে সকাল বেলাটা কোন্

ফাঁকে যে চলিয়া যাইত টেরও পাইত না।

তারপর অবসর সময়ে কল্পনা করিত ক্ষেতে কাজ করিতেছে শ্রীধর। সে ক্ষেত তাদের ঘর হইতে দেখা যাইত না। কিন্তু বেরাচাঁপার মস্ত বড় ক্ষেত দেখিয়াছে সে। সোজা ইষ্টিশান হইতে গ্রাম পর্যন্ত যে সড়ক গিয়াছে তারি দুপাশের দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত।

প্রথম যেদিন পাল্কির মধ্য হইতে ঘোমটার ফাঁক দিয়া সেই ক্ষেত সে দেখিয়াছিল কি রকম অবাক লাগিয়াছিল তার। যতদূর চাও শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত,—ধানগাছের চারায় সবুজ হইয়া গেছে। ঝিরঝিরে বাতাসে ধানের শিষগুলি কেমন খেলা করিতেছে হেলিয়া দুলিয়া। আহা! মহামায়ার বারবার ইচ্ছা করিয়াছিল সেই মুহূর্তে নামিয়া হাত বুলাইয়া বুলাইয়া আদর করে ধানের শিশুদের—আলগোছে ছুঁইয়া ছুঁইয়া চলিয়া যায় যতদূর প্রাণ চায়। খুব আলতো ভাবে হাঁটিতে হইবে, নইলে পায়ের চাপে কচি গাছগুলি মরিয়া যাইবে যে!

কিন্তু নতুন বউ মহামায়া। তিনকুড়ি দশ টাকা দিয়া শ্রীধর তাকে বিয়া করিয়াছে—বউ-এর এসব আব্দার সে সহিবে কেন?

শ্রীধর যেন তার মনের কথাটা অবিকল বুঝিয়াছিল। কানে কানে শুধাইয়াছিল, বড় ভাল লাগচে, নারে বউ?

ধরা পড়িয়া গিয়া সলজ্জ ঘাড় নাড়িয়াছিল মহামায়া।

—লাগবে লাগবে। চাষীর ঘরে না তোর জন্ম? তারপর নিজেই কিছুক্ষণ বাহিরে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, আমারো বড় ভাল লাগেরে। চোখ জুইড়ে যায়। মনে হয়, মা বসুন্ধরা যেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুলে দেছে।

-

কান্নায় স্বপ্ন ভাঙে মহামায়ার।

বুড়া রঘুনাথ মাইতি মরিয়া গেল !

মরিতেছিল সে গত কয়েকদিন ধরিয়াই। খাইতে না পাইলে মানুষ মরিবে বই কী। রঘুনাথ কত দিন খায় নাই কেউ তার হিসাব টুকিয়া রাখে নাই। কথা বলা ছাড়া তার মুখ নড়িতে দেখে নাই কেউ।

যোয়ান ছেলেটা তার নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়ার পর সে থাকিত এখানেই। লোঙরখানায় দুদিন খাইয়া হাগিতে হাগিতে দেহ তার কাঠি হইয়া গিয়াছিল—তবু সে শুইয়া শুইয়া কেবল বলিত, ভাত দে, ওরে আমারে তোরা দুটিখানি ভাত দে। কখনো বা স্বগত আপশোষ করিত, এই হাত আমার ক্ষেতে সোনা ফলিয়েছে, আর আজ দু মুঠো ভাতও পাইনে ? হা ঈশ্বর !

কাল হইতেই শ্বাস উঠিয়াছিল। কালিতারা বলিয়াছিল, এবার তো স্বগ্যে চললি, ভগবানের নাম কর বুড়ো।

কঁকাইতে কঁকাইতে উত্তর দিয়াছিল রঘুনাথ, ভাত ! দু মুঠো ভা-ত !

—আ মর বুড়ো হাভাতে কোথাকার ! সহ্য হয় নাই সতীর মার।

সেই রঘুনাথ মাইতি শেষটায় মরিয়াই গেল ?

কালও যে লোকটা 'ভাত' 'ভাত' করিয়া কাঁদিয়াছে, যোয়ান ছেলের, স্বর্গত পরিবারের নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে,—জীবনে সে আর কথাই কহিবে না ? বাঁচিতে বাঁচিতে কেন যে মানুষ মরিয়া যায়, আর মরিয়াই যদি যায় তাহা হইলে কেন যে আবার বাঁচিয়া ওঠে না—তার কারণটা ঠিকমত ভাবিয়া পায় না মহামায়া। মানুষ মরিলে নাকি তারা হইয়া জন্মায়। কিন্তু কই, আকাশে তো একটিও তারা উঠিল না এখন, এই দিনের বেলায় ? আর তাই যদি, তা হইলে আকাশে তো দিনরাত তারাই শুধু দেখা যাইত—চন্দ্রসূর্য আর উঠিত না।

কিন্তু কিছু ভাবিবে কি মহামায়া, কালিতারার কাণ্ডটাই

দেখিবার মতো। কোথা হইতে সে যেন একথালা ভাত জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু তার আগেই রঘুনাথ মরিয়া গেছে দেখিয়া কী রোখ্ তার!

চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বলে, গেলি তো বুড়ো টেঁসে? দুদণ্ড তর সইলো না? তা আমার ছোঁয়া খাবি কেন? আমি যে বেবুশ্যে মাগি, আমার যে চরিত্তির বলতে কিছু নেই! তা মর্ মর্, সব মরে যা, চুলোয় যা সব ভিখিরির গুষ্টি। সতী হয়ে সব স্বগ্যে যা—

উন্মাদিনীর মতো ভাতগুলা ছিটাইতে ছিটাইতে বাহির হইয়া গেল কালিতারা।

মহামায়ার ছেলে বলিল, মা'রে আজ তো কিছু খেলুম নি? কাল সেই কথ্খন খেইচি। খিদে লাগেনা বুঝি?

কী জবাব দিবে মহামায়া? ক্ষুধা কি তারো পায় নাই? কাল সেই সকালে দু' হাতা খিচুরি খাইয়াছিল, তারপর সারাটা দিন গিয়াছে, আজও বেলা ক প্রহর যেন হইবে। শূন্য পেটে চলিতে গেলে মাথাটা ঝিমঝিম করে, চোখে অন্ধকার দেখে। বুক হইতে ছেলেটার মুখ সরাইয়া দেয়—সন্তানে মাই টানিলে মায়ের বুকের শিরাগুলি ঝন্ঝন্ করে বলিয়া!

কলের কাছে কিছুক্ষণ হত্যা দিয়া পেট পুরিয়া অনেকটা জল খাইল মহামায়া। ছেলেকেও খাওয়াইল। সমস্ত গা'টা তার একবার গুলাইয়া উঠিল—ঢোক গিলিয়া বমির ভাব রোধ করিল।

ছেলে বলিল, আজ সেথায় যাবিনে মা? উই বড় বাড়িতে?

এখান হইতে কয়েক রশি পথ। চৌরাস্তার কাছে বাঁদিকের শান বাঁধান গলি ধরিয়া কিছুটা গেলে লালরঙের একটা বিরাট বাড়ি

পড়ে ডান হাতি। তাঁরা নিশ্চয় বড়লোক আর দয়ার শরীর—নইলে রোজ রোজ আজকালকার বাজারে অত লোককে খাওয়ায় মিনি মাগনা? মাঝে মাঝে গত্যন্তর না দেখিলে ওইখানে হানা দেয় মহামায়া। কারণ হ্যাংলার মতো রোজ রোজ গিয়া হন্নে কুকুরের মতো হাঁ করিয়া থাকা তার পোষাইবে না। আর যা ভীড়, বাপস্। স্থান সংগ্রহই এক এলাহি কাণ্ড। কয়েকদিন তো ব্যর্থ হইয়াই ফিরিতে হইয়াছে।

কাল কিন্তু অভাবিতরূপে খাইতে পাইয়াছিল। ইস., সে কী খাওয়া! ডালচালের ঘোঁট—কাঁকর ভর্তি,—কিন্তু তার মনে হইয়াছিল যেন নবান্নের অন্ন। কতদিন এমন তৃপ্তির সহিত পেট পুরিয়া খায় নাই। হাঘরের মতো সে ও তার ছেলে গিলিয়াছিল শুধু।

কিন্তু অতটুকু ছেলের পেটে ওই সব সহ্য হয় নাকি? উগরাইয়া দিয়াছিল না? চোখ তার সে-সময় কেমন বড় বড় হইয়া গিয়াছিল —ফাটিয়া পড়ে যেন। দেখিয়া শুনিয়া কিন্তু ভারি ভয় লাগিয়াছিল মহামায়ার।

না, ওখানে ও আর যাইবে না।

তবু খাওয়ার সময়কার তৃপ্তির কথা মহামায়ার এখনো মনে পড়ে। গরম ডালচালের ঘোঁটেরও কেমন একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ আছে, স্মরণ করিলেও জিহ্বায় জল আসে। খাওয়ার শেষের দিকে একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ঘুরিয়া ফিরিয়া তদারক করিতেছিলেন—তাঁর সংগীটির দিকে চাহিয়াই কিন্তু চমকাইয়া উঠিয়াছিল ও। দেশের কথা মনে হইয়াছিল তার।—

কোথা দিয়া যেন কী হইয়া গেল। হঠাৎ দেখা গেল ঘরে ঘরে কেমন একটা ব্যস্ততা শুরু হইয়া গেছে। একটা আসন্ন আতংকের ভয়ে সকলের মন ভারগ্রস্ত। বেলেডাংগার তরি-তরকারীর ফড়েরা

ঘন ঘন বেরাচাঁপায় আসা শুরু করিল। উঠোনের মাচা হইতে লাউগাছের চারাটা পর্যন্ত তুলিয়া চাষীরা সঁপিয়া দিল তাদের হাতে। শহর হইতে একটি ভদ্দরলোক ফড়ে আসিয়াছিল চালের খোঁজে, তাকে দেখিতে ঠিক এইরকম। চালের দর নাকি নামিয়া যাইবে—একেবারে সরকারী খবর। যুদ্ধ হইতেছে, জানো না তোমরা? তাই নাকি? হু হু করিতে করিতে সকলে সগুতোলা ধান ছাড়িতে লাগিল। তারপর একমাসের মধ্যেই দর পড়িতে লাগিল। হক্‌চকাইয়া চাষীরা বীজধান পর্যন্ত বেচিয়া ফেলিল।

কিন্তু চাষীদের ঘর হইতে ধান উধাও হইতে না হইতেই যেন আবার চাকা গেল ঘুরিয়া। ধানের দর চড়চড় করিয়া চড়িতে লাগিল—চাষীদের সব শূন্য খামার। মাথায় হাত দিয়া বসিল সকলে—বউ ছেলের দৈনন্দিন ক্ষুধার গ্রাস পর্যন্ত রাখে নাই যে। এদিকে সেই ভদ্দরলোক ফড়ে গ্রাম ছাড়িয়া উধাও।

এরপরের সব কথা আর গুছাইয়া মনে করিতে পারে না মহামায়া। তবে আবছা মনে হয়—দেশের আকাল, অনাবিষ্টি—ঘরে ঘরে হাহাকার —চালের খোঁজে সকলের শহরে আসা—আবার সন্ধ্যায় ফিরিয়া যাওয়া। তারপর রোগের রাজত্ব—অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া পিসিমার মৃত্যু, হরিহরের বিধবা মেয়েটার আত্মহত্যা, বংকুর মৃত্যু, সীতানাথের মৃত্যু, সুখদার মৃত্যু, মনা বুড়ির মৃত্যু! চল্‌ বৌ, আমরা এ গাঁ ছেড়ে চলে যাই। তাও কি হয়! শ্বশুরের ভিটে না? ছিদামের মৃত্যু, অবিনাশ খুড়োর মৃত্যু— বামুন মা'র আত্মহত্যা! চল্‌ বৌ, চল্‌, আর তো পারিনে। শহরে গেলে একটা হিল্লে হবেই—চল্‌ চল্‌, কদ্দিন আর উপোস করে কাটাবি?

তারপর একদিন, মহামায়ার মনে পড়ে, ইষ্টিশানের সেই সড়ক ধরিয়া সে আসিয়া গাড়িতে চাপিয়া বসিয়াছিল শ্রীধরের খোঁজে। কারণ,

শহর হইতে শ্রীধর ফেরে নাই। নিজের পরিবার ও ছেলের মুখে দুমুঠো দিতে পারে নাই বলিয়া ক্ষোভ জাগিয়াছিল তার মনে। পাল্‌কি করিয়া সেদিন সে আসে নাই—পথে হোঁচট খাইতে খাইতে অনেকের মধ্যে সেও মিশিয়া গিয়াছিল। দুপাশের দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেতকে সেদিন আর কচিকচি ধানের শিশুরা সবুজ করিয়া রাখে নাই—যতদূর চাও শুধু বন্ধ্যা মাঠ, জলের অভাবে যেন তৃষ্ণায় তার বুক ফাটিয়া হাঁ হইয়া গেছে!

হঠাৎ-চিৎকারে মহামায়া খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া চাহিল, সব-কয়জন পরিবেশনকারী মিলিয়া কার কার যেন জয়ধ্বনি দিতেছে—

একধারে দাঁড়াইয়া কর্তাবাবু ও তার সংগীটি হাসিতেছে অমায়িক-ভাবে।

পাশে বসা একটি লোক বলিল, যুদ্ধের বাজারে অনেকেই তো লাল হয় শুনিচি—কিন্তুক এমন দরাজ প্রাণ কারুর হয় তা শুনিনি।

হাত চাটিতে চাটিতে জনৈক বৃদ্ধা বলিয়াছিল, আহা, বেঁচে-বর্তে থাক বাছা, রাজা হও।

আর বোবা মহামায়া মনে মনে মা চণ্ডীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছিল, মাগো, ভাতের কষ্টো ওঁর যেন না হয়।

হাঁটিতে হাঁটিতে মহামায়া নিজের অলক্ষেই কখন যে সেই বাড়িটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে খেয়াল নাই। কিন্তু একী, আজ যে খাওয়ার নামগন্ধও নাই? অনেক লোক মিলিয়া জটলা করিতেছে কেন?

মহামায়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। চারিদিকে কেমন এক অস্বস্তির, অসন্তোষের ভাব। কালকের পরিবেশনকারীদের কয়েক-জন কি যেন বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভিখিরির দল সেদিকে কাণ দিলে তো!

—আমরা কর্তাবাবুকে চাই।

—তেনার মুখ থেকেই আমরা সাফ জবাব শুনব।

অবশেষে কর্তাবাবু আসিয়া গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইলেন গম্ভীরভাবে।

—হেই বাবা, আমাদিগে কী আর খেতে দিবে নি?

—কি অপরাধ করনু গো বাবু মশয়!

—তুমি রাজা নোক, তুমি না দিলে যে মাগ ছেলে নিয়ে—

অজস্র অসংখ্য অনুরোধ, ভিক্ষা ও মিনতি।

সকলকে থামিতে ইংগীত করিয়া কর্তাবাবু এবার কথা কহিলেন—

—কি করবো বলো? যাহক দুটো যে তোমাদের দিতে পারছিলুম সে ত আমারি মহা-সৌভাগ্য। তোমাদের মতো দরিদ্রনারায়ণের সেবার এমন সুযোগ জন্মজন্মান্তরের পুণ্যেই না জুটেছিল? কিন্তু ভাগ্যে সইলো না! শেষের দিকে গলা তাঁর ধরিয়া আসিতেছিল, সহসা স্বর ঝাঁঝালো হইয়া উঠিল, সরকার যদি বাদ সাধে তা'লে আমার একার সাধ্যি কী? এই দেখ পিটিশন, সস্তায় চাল চেয়েছিলুম মেজিস্ট্রেটের কাছে—

সহসা তুমুল হল্লায় তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা পড়িল। জনতা এবার উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিবাদ, কৈফিয়ৎ আর প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ হইয়া কর্তাবাবু স্থানত্যাগ করিলেন। পুলিস আসিয়া ভিড় হটাইতে লাগিল।

—শালা খচ্চরের একশেষ। একটা অশ্লীল মুখভংগি করিল একজন।

—ন্যাকাচৈতন! বলি, নিজের গুদোমে তালা এঁটেচো কেন শুন?

—গুদোম মানে?

—জানিস না বুঝি? চালের ব্যবসায় শালা জোঁকের মত ফুলছে। রামকেষ্টপুরে সম্বন্ধির তিন তিনটে আড়ৎ। সব খবর রাখি বাবা, তবে

মুখ ফুটে কিছু বলিনি এ্যাদ্দিন। জানি, বড়লোকের এতটুকু, এতটুকুই ভালো।

—মেজিষ্ট্রেট-ফ্যাজিষ্ট্রেট সব বুজরুকি।

এমনি কতো সব অভিযোগ। মহামায়া সব বুঝিতে পারে না। কিন্তু যতটুকু বুঝিতে পারে তা শুনিবার মত প্রবৃত্তিও তার হয় না। ভাবে, মানুষ মাত্র একদিনে এমন নিমকহারাম হইয়া যায় কেমন করিয়া? সত্যি তো, ইচ্ছা করিয়া কেহ কাহাকে কষ্ট দিতে পারে নাকি? বিশেষ, তাদের মতো ক্ষুধার্তদের ক্ষুধার গ্রাস লইয়া? নিতান্ত অপারগ না হইলে—

ম্লান মুখ তুলিয়া ছেলে শুধায়, আজ আর খেতে দিলে না মা?

মহামায়া ঘাড় নাড়ে।

—কেন দিলে না মা? আমার যে বড্ড খিদে পেয়েচে।

বোবা মহামায়া কেমন করিয়া তার অবুঝ সন্তানকে বুঝাইবে যে ক্ষুধা পাইলেই আজ আর কেউ কাউকে খাইতে দেয় না? পৃথিবীতে কী আর খাদ্য আছে!

কিন্তু তার চোখ দুইটাই কী কম অবুঝ?

রাতে পথে আলো জ্বলে না। লোহার সব খুঁটির মাথায় অবিশ্যি ঝুলানো আলো রহিয়াছে—কিন্তু তার চোখে ঠুলিপরা। চাঁদনী রাত বলিয়াই রক্ষা, নহিলে ভারি খারাপ লাগিত মহামায়ার। গাঁয়েও জোছনা রাতে পথে আলো জ্বলিত না, চৌকিদার নগেনটা বদমাইসি করিয়াই জ্বালাইত না। কিন্তু বাঁশ বন ডিঙাইয়া চাঁদটা যখন সামন্তদের নারকেল গাছের মাথায় উঠিয়া আসিত, তখন সমস্ত গাঁ যেন আলো হইয়া যাইত। নন্দী বাড়ির টিনের চালাটা রূপার মত ঝকঝক করিত। অধিক রাতেও পথে পথে বখাটে ছেলেরা বাগ্দী পাড়া হইতে ফিরিত

বঁধুর নামে সব গান গাহিয়া। তারপর রাত যখন আরো গভীর হইত তখন কেবল ডাকিত ঝিঁ ঝিঁ পোকা। সেই সব রাতে তার ইচ্ছা করিত শ্রীধরকে নিয়া ইষ্টিশানের সেই সড়কের পাশের ক্ষেতের উপর অ-নে-ক-দূ-র হাঁটিয়া আসে। কিন্তু একবার বালিসে মাথা দিলে শ্রীধরের কী আর হুঁস থাকিত? রামচিমটি কাটিলেও হুঁ হাঁ করিত শুধু, তারপর পাশ ফিরিয়া শুইত। তখন এমন রাগ হইত মহামায়ার যে তার ক্রুদ্ধবাসনা জাগিত শ্রীধরের গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিল চড় ঘুঁষি মারিয়া কামড়াইয়া আর খামচাইয়া নিষ্কর্মা যোয়ান মদ্দটার ঘুমের দফা শেষ করিয়া দেয়।

পাশে যেন কারা ফিসফিস কথা কহিতেছে। কিছু বাদ প্রতিবাদ। কাণ খাড়া করিয়া ফিরিয়া চাহিল মহামায়া—

—না মা না। আমি যাবুনি।

—তোর পায়ে পড়ি মা, না করিসনি।

—না না। আমি তোর পায়ে পড়ি।

কে যেন কাঁদে! কে কাঁদে? দেয়ালটার আড়ালে দেখা যায় ডোমজুড়ের নিতাই কামার, তার পরিবার আর তার সেই দশ বছরের হাড়গিলে মেয়েটা। আর ওটা কে? লুঙিপরা গুণ্ডাটা না?

—ট্যাকাগুলো মিঞাসাহেব?

—এই লাও। ফতুয়ার পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দিল গুণ্ডাটা। চাঁদের আলোয় নিতাই সেটা তুলিয়া ধরিল আকাশের পানে।

—দু ট্যাকা?

—ওই এখন লিয়ে লাও। না খাইয়ে দাইয়ে চেহারাটা যা করিয়েছ! কত কাঠখড় পুড়োতে হবে আমাকে, হিসেব রাখ তার?

অস্ফুট স্বরে নিতাই কি বলিল বুঝা গেল না।

মেয়ে তার মা'র বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িল, তোরা, তোরা আমায় বেচে দিলি মা?

গুণ্ডাটা ধমক দেয়, এই ছুঁড়ি, চুপ চুপ। একটা কেলেংকারী করে ফ্যাসাদে ফেলবি?

মা তার কথা কয় না। ফুঁপাইয়া কাঁদে। মেয়ে একবার মা'র, একবার বাপের মুখের দিকে তাকায়।

উত্তর না দিয়া নিতাই আকাশের দিকে নোটটি তুলিয়া শুধু বলে, ভগবান!

গুণ্ডাটা চাপা চিৎকার করে, আবে শালা কাদের, গাড়িসে উতার। তারপর ছেঁচড়াইয়া ছেঁচড়াইয়া মেয়েটাকে টানিতে টানিতে রাজপথের উপর দাঁড়ানো ঘোড়ার গাড়িটার কাছে লইয়া যায়।

—তোদের কাছে আর খেতে চাইবুনি মা। আমায় তোরা তাড়িয়ে দিসনি। মা, মা, বাবাগো—। গাড়োয়ানের স্থান হইতে নামিয়া কাদের ততক্ষণে তাকে মুখে চাপা দিয়া গাড়িতে পুরিয়া ফেলিয়াছে।

হাতের নোটটা আকাশের দিকে তুলিয়া তেমনি চাহিয়া থাকে নিতাই নির্বাক।

গাড়িটা চলিয়া যায়।

সহসা তার পরিবার কঁকাইয়া ওঠে, খেন্তি! ওরে আমার খেন্তিরে!

কোথায় যেন ছিল কালিতারা। আচমকা সে তাদের মধ্যিখানে আসিয়া হাত ঘুরাইয়া সমবেদনা জানায়।

—আহা! কাঁদিস কেন লা বউ? মেয়ে না তোর শ্বশুরবাড়ি গেল? এখন আর ভাবনা কী? কত সোয়ামি, কত মণ্ডামিঠাই!

তারপরই খিলখিল করিয়া হাসি।—বলি হ্যাঁগা বেয়াই, ক'

ট্যাকায় ?

রাগ সহ্য করিতে পারে না নিতাই। ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কালিতারার চুলের গোছা ধরে।

—আরে কর কি! ছাড়ো ছাড়ো। এই কী পীরিতের সময় বেয়াই ? এমন সাজগোজ যে সব ভেস্তে যাবে গো। আজ যে আমার অভিসার—

মাটিতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াও কালিতারার হাসির বেগ থামে না।

সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া কেমন একটা দুর্বোধ্য আতংক জাগে মহামায়ার মনে। কি যেন কী ভাবিয়া সহসা সে ছেলেকে একেবারে বুকের সাথে জড়াইয়া ধরিয়া পরপর অনেকগুলা চুমা খায় তার মাথায়।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল মহামায়া।

অকস্মাৎ শ্রীধরের ডাকে তার ঘুম ভাঙিল।

প্রথমে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তারপর সমুখেই শ্রীধরকে দেখিয়া মুখ ঘুরাইল। না, কখ্‌খনো সে কথা কহিবে না। এতদিন পর্যন্ত যে পরিবার-পুত্রের খোঁজটাও লয় নাই, তার সহিত তার কিসের সম্বন্ধ ? কম নিষ্ঠুর ও ? পুরুষ মানুষ কিনা!

—রাজকন্যের কি মান নাকি ? 'চরণে পেরণাম সখি—'

চুপ-চুপ। উঠিয়া বসিল মহামায়া। স্থান-কাল জ্ঞান নাই একেবারে! আশেপাশে সব কি ইট পাথর শুইয়া আছে ?

—কেন তুই তবে আমারে দেখে মুখ ঘুরোলি ?

না, মুখ ঘুরাইবে না! কেন তুমি অমন করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে ? মহামায়া কাঁদিয়া ফেলে।

—তোরে ছেড়েও কি স্বোয়াস্তিতে ছিলুম রে। এই দেখ্—

শ্রীধর গায়ের কামিজটা খোলে, তোরে দুখ্যু দেয়ার শাস্তি মা চণ্ডী আমারে ভালো করেই দিয়েচে।

ইস্! কী চেহারা হইয়াছে ওর? কণ্ঠা দুইটা একেবারে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, অমন পুরুষ্টু বুকটা খোঁদল হইয়া গেছে, পাঁজরের হাড়গুলা গোণা যায় একেক করিয়া।

আহা! সমবেদনায় স্বামীকে বুকে টানিয়া লয় মহামায়া।

চেহারার কী ছিরি হইয়াছে! খুব কষ্ট পাইয়াছ বুঝি?

বউ-এর বুকে সন্তানের মতো মুখ গুঁজিয়া কথা বলিতে গিয়া গলা ধরিয়া যায় শ্রীধরের। —তা আর কইতে। কদ্দিন উপোসে কেটেচে। শহরের মানুষ ভালো নারে বউ। দোরে দোরে কত ভিক্কেই করেচি—একটা জোন্ও কেউ রাখে না। খালি দূর্দূর ছাইছাই করে—

মহামায়া চুপ করিয়া শোনে।

—শহরের পথেপথে কী কম খোজা খুঁজেচি তোদের।

আর মহামায়া? সে বুঝি চুপচাপ বসিয়াছিল?

—দেশে এবার কী মড়কই লেগেছিল। কোদ্দিয়ে যে কী হয়ে গেল—

ভাবিতেও শিহরিয়া ওঠে মহামায়া।

—পেসাদটা কেমন আছেরে বউ?

তবু ভালো, এতক্ষণে ছেলের কথা মনে হইয়াছে। কম ধকল গিয়াছে ওইটুকু ছেলের উপর দিয়া? কতকষ্টে যে সে উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তা শুধু জানেন মাঁ চণ্ডী। ভালোই হইয়াছে, যার ছেলে তার হাতে এবার সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে চোখ বুজিবে মহামায়া।

—ইস্! তাই বুঝি? দেশের হাল আবার বদলে গেছে বউ।

আবার সেই পুরোনো দিন ফিরে এসেচে। গাঁয়ের সকলে আবার গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছে। সকলের মুখে আবার হাসি ফুটবে—আবার সবাই ক্ষেতে লাঙল দেবে, মাঠ ছেয়ে যাবে সোনার ধানে। হরিহরের বলদজোড়া খুব কাজ দেবে এবার। গাড়ি গাড়ি ফসল তুলে আনবো ঘরে—লোকের উস্‌কানিতে আর—

সত্যি? সত্যি আবার—

—সত্যি! সত্যি! সত্যি! তোরে ছুঁয়ে তিন সত্যি করলুম বউ।

কিন্তু ইহাদের কি হইবে? এই গংগাপদ, বিশু, বিন্দি, হৈম, নিস্তারিণী, নিতাই, সতীর মা? আর সেই যে আটজন, যাদের ঘরদোর সব গিয়াছে,—দু'কাঠা জমি দূরের কথা, মাথা গুঁজিবার আস্তানাও নাই যাদের?

—সব্—সব্বাইকে নিয়ে যাবো আমাদের গাঁয়ে। আমরা তো কত ধান খদ্দেরকে বেচে দি—এবার বিলিয়ে দেব এদের। আমাদেরি চাষীভাই ওরা। আমাদের আর অভাব কিসের বউ?

মহামায়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চাহিয়া থাকে স্বামীর দিকে। এমন সুন্দর সুন্দর সব কথা শ্রীধর শিখিল কোথা হইতে?

একটু থামিয়া শ্রীধর বলে, কত কষ্ট পেয়ে আমরা বেঁচেছি। আমরা কী আর মরতে পারি, না কারুকে মরতে দিতে পারি? না খেয়ে মরার বড় দুখ্যু রে! তার গলা ধরিয়া যায়।

মহামায়ার চোখ ছলছল করিয়া আসে।

—ওকি কাঁদচিস্? কাঁদিস্‌নি, কাঁদিস্‌নি। আর কাঁদেনা। গান শুনবি? গান?

এইখানে? এই রাতে!

—ক্ষেতি কী? ইষ্টিশানের সেই সড়ক ধরে গান গাইতে গাইতে আবার আমরা গাঁয়ে ফিরে যাবো। তারপর আমার সেই মাটি। কদ্দিন ওরে ছুঁইনি বলতো? হয়তো আগাছায় ওর বুক ভরে গেছে!

সহসা শ্রীধর গান ধরে—

লাঙল চালাই আমরা কোদাল চালাই,
নাচের তালে তালে ফসল বাড়াই,
আমরা সোনা ফলাই।—

মহামায়ার খুশি আর ধরে না। ছটফট করে ও। পরিবারের হাত ধরিয়া শ্রীধর বলে, বউ, লোকে জানে তুই বোবা, কথা কইতে পারিস না। কিন্তু তোর মুখের পানে চাইলে তোর মনের কথা আমি বুঝতে পারি।

তারপর আবার শুরু করে—

সকাল থেকে সন্ধে
চাষ করি আনন্দে
ভিজে মাটির গন্ধে,
করিনা কামাই
লাঙল চালাই আমরা কোদাল চালাই।

অসহ্য আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। বুকের ভিতর গিয়া গানটার শেষ কলি বারবার ধাক্কা মারে।

তীব্র উত্তেজনায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল মহামায়া। সমস্ত শরীর তার ঘামে ভিজিয়া গেছে। ছেলে? আমার ছেলে? চারিদিক তাকাইয়া দেখে সে—

দু'হাত দূরে বসিয়া কালিতারা তার ছেলেকে মাই খাওয়াইতেছে, আর ছড়া কাটিতেছে,—

আয় চাঁদ আলো ক'রে।
দুধ দেব বাটি ভ'রে।

উড়কি ধানের মুড়কি দেব
পথে জল খেতে।
আম কাঁঠালের বাগান দেব
ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চাঁদের কপালে চাঁদ টি-প দিয়ে যা॥

তারপর ছেলের গালে নাক ঘসিতে ঘসিতে বলে, বল্‌তো পেসাদ, আমারে একবার মা বল্‌। ব-ল্‌—

ও তাহা হইলে কাঁদিতেও জানে?

চাঁদের আলোয় মহামায়ার চোখ দুইটা কড়্‌কড়্‌ করে।

পাশ ফিরিয়া শোয় সে। চোখ বোজে।

সবে ভোর হইয়াছে।

কিন্তু বেঘোরে ঘুমাইয়া থাকিলে মহামায়া তা বুঝিবে কেমন করিয়া?

মহামায়াকে এক তীব্র ধাক্কা দিয়া দিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল সতীর মা।

—ওরে অভাগি! তোর যে ইদিকে কী সব্বনাশ—

তড়িৎপৃষ্টের মতো চকিতে উঠিয়া বসিল মহামায়া। সকলেই ইতিমধ্যে জাগিয়াছে, ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে তার চারিপাশে, অনুচ্চ স্বরে কথা কহিতেছে, সমবেদনা জানাইতেছে, কেউবা কাঁদিতেছে চাপা কণ্ঠে। কেমন একটা অদ্ভুত ভয়ার্ত আবহাওয়া।

ছেলে?

সামনে চাহিয়া দেখিল মহামায়া: দু'হাত দূরে তার ছেলেকে

কোলে লইয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছে সতীর মা। বিস্ময়ে ও আতংকে মহামায়ার চোখ বড়ো বড়ো হইয়া যায়।

—ও ডাইনি মাগিকে আমি পের্‌থমেই সন্দ করেছিনু। কাঁদিতে কাঁদিতে সতীর মা কহিতে লাগিল, নিজের পেটের ছেলেকে যে গলা টিপে শেষ করতে পারে, সে না পারে কী? তারপর পেসাদের মুখটা একেবারে নিজের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া আর্তনাদ করিয়া ওঠে—আহ্হা বাছারে—

অকস্মাৎ মহামায়ার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। পেসাদের উপর একেবারে হুমড়ি খাইয়া পড়িল সে। দুই হাত দিয়া পেসাদকে কয়েকবার নাড়া দিল, তার চোখে মুখে সর্বাংগে বারবার হাত বুলাইয়া গেল, কিন্তু পেসাদ কথা কওয়া দূরে থাক, একবার নড়িল না পর্যন্ত। ছেলের মুখের দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল মহামায়া—চোখ দুইটা তার কোটর হইতে ফাটিয়া পড়ে যেন, ঠোঁটের কস্ বাহিয়া নামিয়াছে ঘন রক্তের ধারা,—সতীর মা'র কোল হইতে মাথাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে নিচে, আর তার ছোট্ট শীর্ণ দেহটা হইয়া গিয়াছে পাথরের মত শক্ত ও বরফ-শীতল। দুই হাত দিয়া জাপটাইয়া ধরিয়া ছেলেকে সে নিজের বুকে তুলিয়া লইল। তারপর তার সারা শরীরে চুমা খাইতে খাইতে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

সন্তান-স্নেহ প্রকাশের এই তার প্রক্রিয়া।

মৃত সন্তানকে বুকে লইয়া মহামায়া তার বোবা চোখ চারিপাশে মেলিয়া দিল। কিছুই যেন তার বোধগম্য হইতেছে না।

ধরা গলায় নিস্তারিণী কহিল, পাঁচ পাঁচটা আঙুলের দাগে কচি গলায় একেবারে কালসিটে পড়ে গেছে গো—

অনেকগুলি চাপা কণ্ঠের ক্রন্দন।

মহামায়ার বেশবাস বিত্রস্ত হইয়া গিয়াছিল। পাশে আসিয়া তার মাথায় শতছিন্ন শাড়ির ছেঁড়া আঁচলটা তুলিয়া দিতে দিতে হৈম সান্ত্বনা দিল, কাঁদিস না লো, কাঁদিস না।

হৈম কাঁদিয়া ফেলে।

কিন্তু মহামায়া কাঁদিবে কি, এখনো সে সবকিছু ঠিকমত ঠাওর করিতে পারিলে তো? পেসাদ যে মরিয়া গেছে, ইহ-জীবনে তার পেসাদ যে আর বাঁচিয়া উঠিবে না, তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মা বলিয়া আর ডাকিবে না—এমন অসম্ভব সব কথা সে বিশ্বাস করে কি করিয়া? পুরুষ মানুষ হইলেও ওতো আর যোয়ান শ্রীধর নয়, ছোট্ট শিশু—এমন নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন কখনো হইতে পারে ও? শ্রীধর গিয়াছে, গিয়াছে—তাই বলিয়া পেসাদ কখনো তার মা-কে কাঁদাইয়া একেলা চলিয়া যাইতে পারে? ভগবান আছেন না?

মহামায়ার একবার মনে হইল, কালরাতে সে একটি ভারি সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছিল, আর এখন দেখিতেছে একটি দুঃস্বপ্ন। এটা দিন কিনা, তাই। আসুক আবার সেই চাঁদিনী রাত!

চোখ বুজিয়া মহামায়া হয়তো চাঁদিনী রাতের প্রতীক্ষা করে।

কিছুক্ষণ রুদ্ধ আক্রোশে গজগজ করিয়া গংগাপদ কহিল, "সে হারামজাদী গেল কোথা? একবার পাই তারে তো হাড় এক জাগায় আর মাস এক জাগায়—

গংগাপদ দাঁত কড়্মড়্ করে।

কে? কার কথা বলিতেছে এরা? কালিতারা? চোখ মেলিয়া চাহিল মহামায়া। না না, কালিতারা কখ্খনো একাজ করিতে পারে না। ভুল ভুল, ওগো তোমরা ভুল করিয়াছ। ছেলে তার মরে নাই। অভাগিনী মহামায়ার নয়নের নিধি যে সে কখনো মরিতে পারে! মা চণ্ডী আছেন না!

তোমরা একটু সরিয়া যাও, ছেলে তার অগ্নি জাগিয়া উঠিবে। কথা কহিবে। দেখিও, তোমরা তখন কি রকম অবাক হইয়া যাইবে। যাও যাও, ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা একটু সরিয়া যাও। ছেলে তার কথা কহিতেছে না বলিয়া মহামায়ার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে—ওকে একটু প্রাণ ভরিয়া নিশ্বাস লইতে দাও। ছেলে হাসিতেছে না বলিয়া চোখে অন্ধকার দেখিতেছে মহামায়া—পথ ছাড়িয়া দাও, সূর্যের আলো আসিয়া পড়ুক ওর চোখে।

মহামায়া ছটফট করে।

একটু বেলায় চারিদিক ঢাকা গাড়ি আসিল। যে গাড়ি রঘুনাথকে লইয়া গিয়াছিল সেইটাই বোধ হয়। জোর করিয়া তারা মহামায়ার কোল হইতে পেসাদকে কাড়িয়া লইল। গোঁ গোঁ শব্দ করিল মহামায়া, হাত পা ছুঁড়িয়া বহু প্রতিবাদ করিল—কিন্তু কেউ শুনিল না।

কত বড়ো যেন দাবি উহাদের মহামায়ার ছেলের উপর! কই, কাল যখন তার ছেলে সারাদিন না খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তখন তো কেউ একবার রা-ও করো নাই?

মহামায়ার চোখের সামনে ওরা পেসাদকে চ্যাংদোলা করিয়া গাড়ির মধ্যে ফেলিল। অমন করিয়া ওরা পেসাদকে টানা-হেঁচড়া করিতেছে কেন? কচি দেহে ব্যথা লাগেনা বুঝি?

ও কী! ওগো তোমরা আমার বাছার মুখ অমন করিয়া ঢাকিয়া দিও না, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে যে!

গাড়ি চলিয়া গেল।

কালিতারা! কালিতারা কোথায়? আসিয়া সে একবার দেখুক

গাড়ির চাকাগুলা কেমন ঘুরিতে ঘুরিতে দূ-রে সরিয়া যাইতেছে। ওরি ভিতরে ওরা পেসাদকে লইয়া যাইতেছে। কালিতারা, শিগ্গীর ওদের মানা কর, নইলে তোকে আর মা বলিয়া ডাকিবে কে ?

মহামায়া চারিদিক তাকায়। হয়তো কালিতারাকে খোঁজে।

রঘুনাথ একদিন মরিয়া গিয়াছিল। সেদিন সকলে যেমন কিছুক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া সমবেদনা জানাইয়া চলিয়া গিয়াছিল যে যার ধান্ধায় জীবিকার খোঁজে,—আজও তেম্নি সকলে চলিয়া গেল।

শুধু গংগাপদ আসিয়া বারবার তাকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া কোনো কথা কহিতে সাহস করিল না।

আর বারকয়েক ডাকিয়া ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া গেল পোয়াতি বিন্দি।

খর দুপুরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে।......

বিকাল হইতে না হইতেই শহর যেন জাগিয়া ওঠে।......

সন্ধ্যায় নগরীর রূপ বদলায়।.......

রাতে পথে আলো জ্বলে না।.......

মহামায়া চুপচাপ সেই জায়গায় বসিয়া।

অনেকে অনেক কথাই বলিয়া চলে, কিছু কাণে যায় না তার। কাণে যায় তো প্রাণে লাগে না। থাকিয়া থাকিয়া তার বুকটা কেবলি

খাঁ খাঁ করিয়া ওঠে, দুহাতে সে জড়াইয়া ধরে নিজেকে। এখনো তার বিশ্বাস হয় না যে পেসাদ সত্যি মরিয়া গেছে। ও যেন প্রতীক্ষা করে, এখুনি পেসাদ আসিয়া ওর থুতনি নাড়া দিয়া শুধাইবে, আজ সেথায় যাবিনে মা? উ-ই বড় বাড়িতে? কিম্বা কাতর স্বরে কহিবে, মারে, আজ তো কিছু খেলুম নি। আমার যে বড্ড খিদে পেয়েচে। ওরা কি আমাদিগে আর খেতে দিবে না মা?

কেউ না দিক, মহামায়া দিবে। যতক্ষণ সে মা ততক্ষণ কি সে তার সন্তানকে অনাহারে মরিতে দিতে পারে?

প্রকাশ্যভাবে বুক খুলিয়া নিজের শীর্ণ স্তনে হাত বুলায় মহামায়া। অনুভব করিবার চেষ্টা করে যেন পেসাদের মুখের লালায় স্তনের বোঁটা তার পিচ্ছিল হইয়া আছে।

মানদা আসিয়া বলে, ওঠ্ অভাগি, ওঠ্। যে চলে গেছে তার তরে ভেবে আর কি করবি? নে, চোখে মুখে একটু জল দিয়ে নে। ফ্যান এনিচি এক বাটি।

তীব্র ভাবে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করে মহামায়া। তার পেসাদ দুই দিন খায় নাই। তাকে ফেলিয়া কোন্ মুখে সে ফ্যানের বাটিতে চুমুক দিবে! বাটি ধরিলে হাত তার থরথর করিবে না?

কিছুক্ষণ সাধাসাধি করিয়া মানদা চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ আচ্ছন্নের মত থাকার পর সহসা তার মনে হইল, পেসাদ নাকি মাই টানিয়া দুধ পাইত না, তাই অভিযোগ করিত আর কাঁদিত। সন্তানের জন্য মায়ের স্তনে দুধ থাকে না, তাও কী কখনো হইতে পারে? কী বোকাই না ছিল পেসাদটা!

বুক খুলিয়া মহামায়া নিজের শীর্ণ স্তন দুইটাকে বারবার পর্যবেক্ষণ করে। পেসাদ হইবার পর সময়মত তাকে মাই খাওয়াইতে না পারিলে ফুলিয়া গিয়া স্তন দুইটা তার কি রকম টনটন করিত! আজও সেকথা মনে পড়ে।

নিজের একটি স্তনকে ও টিপিয়া ধরে প্রাণপণে। বুকের শিরায় শিরায় টান ধরে, কিন্তু তা অনুভব করিবার শক্তি ওর নাই। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন দুই হাতের মুঠায় নামিয়া আসে।

আসুক, পেসাদ আসিয়া একবার দেখুক কেমন তার মায়ের বুকে দুধ নাই।

মহামায়ার স্তনের বোঁটায় লাল লাল সব দুধের ফোঁটা দেখা যায়। যন্ত্রণায় তার দুই চোখ তখন জলে ছাপাইয়া গেছে।

কিন্তু কই, পেসাদ তো আসিল না?

ও তাহা হইলে সত্যি সত্যিই মরিয়া গেছে!

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড হাহাকার কান্নার আকারে বুক ফাটিয়া বাহির হইতেছিল, মৃত পিস্‌শাশুড়ীর একটি কথা ভাবিয়া প্রাণপণে তা রোধ করিল মহামায়া।

পিস্‌শাশুড়ী বলিত, ছোট ছোট ছেলেরা সব দেব্‌তা বউ, ওদের হেনেস্তা করিস্ নি। পৃথিবীতে কোনো পাপ, কোনো অন্যায় ওরা করে না, তাই মরলে সব স্বগ্যে যায়, স্বগ্যের দেব্‌তা হয়ে যায়।

পেসাদও তাহা হইলে স্বগ্যে গিয়াছে। স্বগ্যের দেবতা হইয়া গেছে তার পেসাদ। সেখানে সে পেট পুরিয়া দুবেলা দুমুঠা খাইতে পাইবে। সুখে থাকিবে। কতদিন তার মুখে হাসি দেখে নাই মহামায়া। স্বগ্যে সে নিশ্চয় প্রাণ ভরিয়া হাসিবে।

এর বেশী আর কি চায় সে? এর চেয়ে বড়ো আর কী প্রার্থনা

আছে তার ?

পেসাদ মরিয়া গেছে, ভালোই হইয়াছে।

সন্তানের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া খুশি হইবার চেষ্টা করে মহামায়া। আকাশের দিকে চোখ মেলিয়া তাকায়—কাল পূর্ণিমা গিয়াছে, আজ দেরীতে চাঁদ উঠিবে। আকাশে এখন কয়েকটি তারা। ওর মধ্যে কোন্‌টি তার পেসাদ ?

বেশীক্ষণ শূন্যে চাহিতে পারে না।

চাঁদের আলোয় চোখ দুইটা তার কড়্‌কড়্‌ করে।

রাতটা কোনমতে আধাঘুমে কাটিয়া যায়। ভোর হইতে না হইতে আবার সকলের মধ্যে দিনের জন্য প্রস্তুতির সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই যেন এই সকালটির উন্মুখ প্রতীক্ষায় থাকে। আজকের দিনেই যেন তাদের জীবনের যা-কিছু-একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাইবে।

শুধু ম্লান মুখে রাত্রির টহল সারিয়া ফেরে গংগাপদ।

মিছিলে মিশিয়া গিয়া যান্ত্রিক গতিতে বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে মহামায়াও আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে তার শরীরের স্নায়ুগুলা ঝিমাইয়া গেছে, দেহ অবশ হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। তবু যেন একটা নাড়ির টান রহিয়াছে এই স্থানটির সহিত, তাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অগ্রাহ্য করিবার শক্তি নাই।

এই পৃথিবীতে পেটের চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর আছে নাকি ?

ভিখিরিদের বিচিত্র কলরব শুরু যাত্রীদের ঘিরিয়া। সাহায্য সহানুভূতি উপদেশ ও তিরস্কারের লেনদেন চলে। শুধু কথা কথা কথা—কথারই জয়জয়কার। যত বিনাইয়া বিনাইয়া, চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কহিতে পারিবে—অজস্র দানে মুঠা তোমার তত যাইবে ভরিয়া।

যত চীৎকার করিয়া তুমি কাঁদিতে পারিবে, সকলের চোখে তত ডাকিবে অশ্রুর বান।

বোবা মহামায়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া দেখে শুধু।

তারপর সহসা আর্ত কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে।

শূন্য দৃষ্টি আকাশে ছুঁড়িয়া প্রার্থনা করে, হে ভগবান! আমাকে শুধু কথা কহিবার শক্তি দাও, শক্তি দাও।

হে মা চণ্ডী! আমার মুখে কথা দাও, কথা দাও।

স্বর্গ আর পৃথিবী

(মণি-কে)

শ্রাবণ
১৩৫১

অবশেষে ধর্মঘট করাই স্থির হলো।—

স্থির হলো, যতদিন না কর্তৃপক্ষ সমস্ত দাবি বিনা দ্বিধায় মেনে নেয় ততদিন এই ধর্মঘটের ভেতর দিয়েই আপোষহীন লড়াই তারা চালাবে।

কমরেড বিলাস বললে, স্ট্রাইক করা সহজ, কিন্তু একে চালু রাখাই শক্ত। অনেক অত্যেচার হবে আমাদের ওপর, অনেক দুঃখ্যু দেবে ওরা, দেখাবে অজস্র লোভ—কিন্তু সামান্য ভুলেও যেন আমরা সে-ফাঁদে পা না দেই, ভাইসব। জেনো, আজ আমরা যত আঘাত, যত কষ্ট পাব,—তার পুরস্কারও তেমনি ভালোভাবে মিলবে একদিন।

হালিম যখন তার খুপরীতে ফিরে এল তখন সেখানে রীতিমত একটা হট্টগোল পড়ে গেছে। তার চারটি সন্তানই পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করে দিয়েছে, আর নানি পাইকারী ভাবে সান্ত্বনা বিলোতে ব্যস্ত। আমিনা একপাশে উনোনে ফুঁ দিচ্ছে।

হালিম জিজ্ঞেস করলে, কী ব্যাপার গফুরের মা?

আমিনা যা উত্তর দিল তাতে ক'রে মজুর জীবনের দৈনন্দিন দৈন্যটাই প্রকাশ হয়ে পড়লো।

বিস্মিত হয়ে হালিম বললে, কেন? আঞ্জুমান থেকে চাল দিয়ে যায়নি?

—এই মাত্তর দিয়ে গেল!

—তা একটু দেরী হয়েচে তো কী? যাক,—এই গফুর, ফুলি, আব্বাস, বই নিয়ে আয়।

বাপকে দেখে ওদের কান্না থেমেছিল। এবার তার ডাকে যে-যার সুর-সুর করে সামনে এসে বসলো। প্রাত্যহিক পাঠের পুনরাবৃত্তি চলবে—শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এর প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা শিশুগুলির নেই।

হালিম প্রদীপের সল্‌তেটা উঁচিয়ে দিল।

নানি বললে, হ্যাঁরে, মিটিনে কী হল আজ?

—কাল থেকে আবার ইস্ট্রাইক চালু হবে নানি।

তারপর পাঁচ বছরের ছেলে আব্বাসের দিকে তাকিয়ে শুধালো, আচ্ছা, বলতো বাপ লেনিন কে ছিল?

—কম্‌লেদ লেনিন বাপজান?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—মজুরের সেনাপতি।

—কোথাকার?

আব্বাস ভাবিত হয়েঁ উঠলো।

—তোর কিস্‌সু মনে থাকে না। কালই না বলে দিলুম?

পাশ থেকে ফুলি বললে, আমি বলি?

—বল্‌।

—রুশ দেশের।

তাকে সংশোধন করে দিল গফুর, শুধু রুশ দেশের নয়, সারা ছুনিয়ার।

—ঠিক ঠিক। ফুলি ও আব্বাস সায় দিয়ে উঠলো।

আমিনা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল।

এবার সে বললে, তা'লে কাল থেকে তুমি আর কাজে যাবে না বলো?

—ককৃখনো না। স্বরের ওপর রীতিমত জোর দিল হালিম।

চাল ধুতে ধুতে নানি বললে, এবার তা'লে আমরা জিতবো,

কী বলিস্ ?

—আলবৎ। সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসে হালিমের গলা চড়ে উঠলো, যদ্দিন না জিতি লড়াই তদ্দিন আমাদের থামবে না।

বাড়িতে পা দেবার আগেই বিলাস শুনতে পেল তার প্রথম পুত্র চীৎকার করে পড়ছে, 'সম্রাট পঞ্চম জর্জ পরম দয়ালু। তিনি ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। তিনি ভারতের, তিনি ভারতের—'

গৃহশিক্ষক সংশোধন করে দিলেন, ভারতের নয়, 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের।'

সত্যনাথ যেন কোথায় ছিলেন, ঘরে পা দিতেই সংগে সংগে আবির্ভূত হলেন।

—হ্যাঁরে, কিছু হলো আজ ?

—কোথায় বাবা! জামা খুলতে খুলতে বিলাস উত্তর দিল, চাকরীর বাজার ত দেখচ।

—কিন্তু, সংসারের হালটাও একবার দেখা দরকার ? মুখের ওপর কথাটা ছুঁড়ে মারলেন তিনি।

—আমিও চেষ্টার অন্ত রাখিনি বাবা।

—ঐ মিলেই না হয় চেষ্টা কর একবার। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সত্যনাথ বললেন, যা ডামাডোলের বাজার,—যা'না কাল একবার হেনরী সাএবের কাছে।

—তুমি কী বলচ! প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো বিলাস।

—কেন, খুব কী অশ্লীল শোনাচ্চে ? তাঁর স্বর ধারালো হয়ে এল।

—শ্রমিকদের দিয়ে আমি ধর্মঘট করাচ্ছি, অসীম বিশ্বাসে ওরা

আমার ওপর নির্ভর করে আছে—আর আমি কিনা—

—ওঃ! বাধা দিয়ে সত্যনাথ বললেন, তুমি যে আজকাল কমিউনিস্ট্ হয়েছ, জানতাম না।

তারপর কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, সংসারে সবাই না খেতে পেয়ে মরুক—আর তুমি বিপ্লব কর। চমৎকার, চমৎকার খোকা! আমি সেকেলে বুড়ো হয়েও তোমাদের যুগের ক্ষুরে শতকোটি নমস্কার—

—বাবা, শান্তকণ্ঠে বিলাস বললে, শিক্ষিত হয়েও একটা জিনিষ আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। এই বেকার সমস্যাকে জিইয়ে রেখেই তো ধনতান্ত্রিক সভ্যতা টিঁকে থাকে। তাই না আমরা—

—থামো! সত্যনাথ গর্জন করে উঠলেন, আমি তোমার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নই।

পিতার নাটকীয় প্রস্থান।

অন্য দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে বধূর মন্থর প্রবেশ।

—বাবা কী বললেন শুনেছ?

—শুনেছি। মালতী বললে, ওঁর আর কী দোষ বলো, সারাদিন সব ধাক্কাটা তো ওঁকেই সামলাতে হয়।

—হুঁ। একটু থেমে বিলাস বললে, তুমিও আজ একথা বলচো মালতী?

মালতী চুপ করে রইলো।

—আচ্ছা, মালতীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিলাস শুধালো, বিয়ের আগে এ মন্ত্রে আমায় কে দীক্ষা দিয়েছিল, লতা? সেদিন তুমিই কী আমার পাশে এসে দাঁড়াও নি? বিলাস মালতীর হাত ধরলো।

—তোমার সে লতা মরে যায়নি গো, আজো সে তোমারই পাশে

দাঁড়িয়ে। কিন্তু—

—কিন্তু?

—কিন্তু আজ যে তাকে আরো অনেকের পাশেই দাঁড়াতে হয়, দেখতে হয় আরো অনেক কিছুই।

—হ্যাঁ। মালতীর হাত ছেড়ে দিয়ে বিলাস বললে, আজ সে ছেলের মা হয়েছে, ঘরের বউ হয়েছে, অনেকের পাশে দাঁড়িয়ে অনেক দিক তাকে সামলাতে হয় বই কী!

—তুমি রাগ করলে?

—অন্যায় করে থাকি ত বলো, ক্ষমা চাইছি?

—ছিঃ, পাগলামি করে না। ভেবে দেখ, বাবার পেন্‌সনের আয় মাত্র ষাট টাকা। ওতে কী আর সংসার চলে? চারিদিকে ধারকর্জ। ইস্কুলের মাইনে বাকি তিন মাসের। বললুম, হাফ্‌ফ্রির একটা চেষ্টা করো, তুমি বললে তোমার লজ্জা করে,—বাবার মাথা কাটা যায়। আমি ত আর নিজে যেতে পারিনে? এদিকে গয়লা, মুদি, মাষ্টার—

—সব মানলুম লতা। কিন্তু তুমিও আই-এ পাশ করেছিলে। মাষ্টারের বদলে, ছেলেদের বাড়িতে পড়ানোটা ত তুমিও দেখতে পারো। কয়েকটা টাকাও তা হলে বাঁচে।

—কিন্তু, তোমার ছেলে পড়ানো ছাড়াও যে আমার আরো কাজ আছে সে কথা ভুলে যাও কেন্? ঠাকুরের কাজ, ঝিয়ের কাজ, ধোপার কাজ—আই-এ পাশ মালতী ক্রমে রূপান্তরিতা হতে লাগলো।

—ও। বলে একটি ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিলাস টেবলের কাছে এগিয়ে এল।

বর্তমান ধর্মঘট সম্বন্ধে এক জোরালো ইশ্‌তেহার তাকে লিখতে হবে।

অধিক রাতে শোয়ার জন্য বেলায় ঘুম ভাঙলো হালিমের। খাটিয়ায় শুয়েই একটা বিড়ি ধরিয়ে সে গতরাত্রির দৃশ্যটা রোমন্থন করবার চেষ্টা করতে লাগলো। উঃ, কী উদ্দীপনা সে দেখেছে প্রত্যেকটি মজুরভাইয়ের চোখে মুখে। সংকল্প থেকে একচুলও তারা নড়েনি, নড়বেও না। ও জানে, এই চারদিনের স্ট্রাইকেই অনেকের একদিন অনাহারে কেটেছে। তবু কী গভীর আত্মবিশ্বাস আর দৃঢ়তা তাদের মধ্যে।—এই লড়াই তারা জিতবেই জিতবে ঃ উল্লাসে ও উত্তেজনায় নিভে-যাওয়া বিড়িতে ঘন ঘন টান দিতে লাগলো হালিম।

—গোফুরের বাপ। আমিনা পাশে এসে দাঁড়ালো।

—কিরে? উঠে বসলো হালিম।

একটু ইতস্তত করে আমিনা বললে, এই নাও।

—কি ওটা?

—হাত পাতো।

হালিমের হাতে যেটা পড়লো সেটা একটা রূপোর হাঁসুলি। ওর মনে পড়লো আমিনার আম্মা ওদের সাদির সময় এটি যৌতুক দিয়েছিল।

হালিম অবাক হয়ে গেল। বললে, কি হবেরে এতে?

—নগেন সাউ-এর কাছে নিয়ে যাও।

—এটা বেচবি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমিনা হাসলো, ঘরে যে একদম—

—কিন্তু, আর দুটো দিন কোনমতে চালানা গফুরের মা। এবার আমরা জিতবোই।

—তাইত বলচি, কণ্ঠে উৎসাহ এনে আমিনা বললে, এটা বেচলে কদিন তবু চলবে। নইলে এ বেলাই—

আলস্য ভেঙে উঠে দাঁড়ালো হালিম। হাঁসুলিটার দিকে সে

একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো : তার প্রথম যৌবনের স্মৃতি। বিক্রির কথাটায় তার মনে একটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

কিন্তু এ দুর্বলতাকে ও ঝেড়ে ফেললে। যাক, পুরোনো কথা ভেবে লাভ নেই। এটা বিক্রি করে ওদের বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে লড়াই-এ জেতবার জন্য।

পরম স্নেহে ও একবার আমিনার দিকে চাইলো। তার নিটোল শরীর ব্যেপে এক সুস্থ সজীব স্বাস্থ্যের প্রকাশ। অর্ধাহারে চোখের কোলে কালি পড়েছে, কিন্তু ঠোঁট দুটি যেন হাসছে।

তার কাঁধে হাত রেখে হালিম জিজ্ঞেস করলো, এটা বেচতে তোর একটুও দুখ্যু হবেনা রে?

—বা-রে, দুখ্যু হবে কেন? স্বামীর বোকামিতে আমিনা ছোট্ট কিশোরীর মত খিলখিল করে হেসে উঠলো।

অসহ্য লজ্জায় হালিম তখন রাস্তায়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ক্ষণিক বিশ্রামের ফাঁকে একটা বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল বিলাস।

ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলো মালতী।

—হ্যাঁগা, তুমি কি মানুষ? মালতী ফেটে পড়লো।

—সহসা এ সন্দেহ কেন সহধর্মিণী? বই মুড়ে মালতীর মুখের দিকে তাকালো বিলাস : তার চোখেমুখে আগুন জ্বলছে।

—উত্তর দাও। উত্তর দাও আমার কথার।

—তোমার আত্মজদেরই জিজ্ঞেস করো তা হলে। বইটা আবার খুললো বিলাস, কিম্বা আমার জন্মদাতাকে। মেণ্ডিলিয়ন বলে—

— আবার মুখ নেড়ে ঠাট্টা করতে একটু লজ্জাও হচ্ছে না তোমার?

প্রত্যুত্তরের পরোয়া না করেই সমান সুরে মালতী বললে, এই যে ছেলে দুটোকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল, তাতে কী, তাতে কী—উত্তেজনায় মালতীর সমস্ত শরীর ও কণ্ঠ থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

—তাড়িয়ে দিল! কথাটা যেন সপাৎ করে এক ঘা চাবুক কষালো বিলাসের মুখের ওপর। চকিতে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—কেন?

—হেড মাষ্টার বলেচে, মাইনে দেবার যাদের ক্ষমতা নেই, তাদের আবার লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার শখ কেন?

—সত্যিই ত। বিদ্রূপের বিদ্যুতে তার কণ্ঠ ঝলসে গেল, এ অন্যায় আব্দার তাঁরা মানুষ হয়ে সহ্য করবেন কেন?

—বাবার মাথা কাটা গিয়েচে। তিনি ঘরে খিল দিয়েছেন। তবুও কী তোমার হুঁশ হবে না? তুমি কী—

—মানুষ আর হতে পারলুম কৈ। আস্তে আস্তে বসে বিলাস বললে, অর্থ যখন নেই, পাশপোর্টই যে তখন হস্তচ্যুত। কিন্তু কী করবো বলো, চাকরীর বাজারেও যে ও একটা মস্ত বড়ো ক্যাপিট্যাল?

—তুমি থামো। তোমার উপদেশ শুনতে আমি আসিনি।

—জানি, সে ধৈর্য তোমার আজ নেই।

চড়া সুরে মালতী বলতে লাগলো, আদর্শ আদর্শ তুমি করো, সংগ্রামের ধূয়ো তোল, অথচ এটা বোঝ না যে জীবনের কাছেই ওর যা কিছু দাম? জীবনই যদি মরে গেল, তবে কী হবে তোমার বই-এর কথা আউড়িয়ে?

বিলাস চুপ করে রইলো।

—সংসারটা যে একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তা কি একবারো তোমার চোখে পড়ে না? দিনকে দিন বাইরে যে মুখ

দেখাবারো জো থাকচে না,—তা কি তুমি একটুও বোঝ না? এরপর, গলার স্বর ভারী হয়ে এল মালতীর, বাবা বললেন, এরপর এর একটা বিহিত না হলে তিনি বিষ—

—বিষ! আতংকে চেঁচিয়ে উঠলো বিলাস।

—হ্যাঁ, তিনি বিষ খাবেন। আর আমিও, একেবারে ভেঙে পড়লো মালতী, আমিও তোমার সংসার থেকে নিস্তার নেব। তখন থেক তুমি তোমার আদর্শ নিয়ে।

সহসা কী যেন একটা গোলমাল হয়ে গেল বিলাসের মস্তিষ্কে। তার অন্তরের ভিৎ পর্যন্ত নড়ে উঠলো : বাবা বিষ খাবেন। মালতী—

উঠে এসে মালতীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো বিলাস।

—ছিঃ মলি, এমন করে না। কেন এমন অবুঝ হও? বলো, আমি কী করতে পারি?

—কেন পারো না? মালতীর গলা ধরে গেল, কাল যদি তুমি নেকলেশটা বিক্রি করতে, তাহলে আজ আর এই অপমানটা সহ্য করতে হত না।

—ওই নেকলেশটা! আহত কণ্ঠে বিলাস বললে, তুমি কী জানো না ওর স্মৃতি কতো বড়ো?

—জানি। সেই স্মৃতি নিয়েই তুমি ধুয়ে খেও। বিলাসের চোখের ওপর চোখ রেখে মালতী বললে, আচ্ছা, তুমি না রিয়ালিষ্ট? কী করে তুমি মানুষের থেকে তার স্মৃতিকেই বড়ো করে দেখ? যার স্মৃতির ওপর এত দরদ তোমার সে যে মরে যাচ্ছে, তাও কী চোখে পড়ে না? দুদিন বাদেই যখন—

মালতী মুখ নামালো। ক্ষোভে ও অভিমানে ওর চোখ দিয়ে

টপটপ করে জল পড়তে লাগলো।

সত্যিই ত! বিলাসের যেন সম্বিৎ ফিরে এল। মালতীর দিকে তাকিয়ে দেখলো তার শরীরের রেখায় রেখায় আসন্ন মাতৃত্বের ইশারা। এমনি করেই প্রত্যেকটি বছরের পদক্ষেপে তার মালতীর ক্রম-মৃত্যু ঘটেছে। বর্তমানের মালতী আজ অতীতের ভগ্নাংশ। আর দারিদ্র জুগিয়েছে ইন্ধন। কিন্তু এই দারিদ্র'র ট্রাজেডি এখানে কত বেশী! মধ্যবিত্ত সংসারে দারিদ্র তার সহজ পথে প্রকাশ পায় না: বুদ্ধিগত আত্মচেতনার লজ্জা আর সমালোচনা তুলাদণ্ডের অপমান ও ভয় এসে মাথা তোলে। তাই ভেতরে ভেতরে তা সংসারের ভিত্তিভূমি পর্যন্ত ঝাঁঝরা করে দিয়ে যায়। তারপর সামান্য আঘাতে আকস্মিক ধূলিসাৎ।

সন্ধানী চক্ষু ও বিশ্লেষণী মন নিয়ে বিলাস দেখলো সেই চরমের সূচনা আজ সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘিরে।

তার লক্ষ্য পড়লো মালতীর দিকে: এই সেই মালতী! মাধুর্য ও মননশীলতায় প্রোজ্জ্বল এই কি তার বিয়ের আগের দীপ্ততেজ মেয়েটি? কী পরিবর্তনই না হয়েছে!

বৃহত্তর শৃংখল ভাঙার ব্রত নিয়ে যে ক্ষুদ্র শৃংখলটিকে তারা বরণ করেছিল তা-ই আজ জগদ্দল পাষাণের মত হয়ে রইলো।

আদর্শকে বড়ো করে দেখেছে। আদর্শ, তার বিপ্লবের আদর্শ!

কিন্তু কী দিয়েছে তার আদর্শ? —শুধু লাঞ্ছনা আর অপমান, দারিদ্র এবং অভিশাপ। তিলে তিলে ক্রম-মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে।

তার বিপ্লব ভেঙেছে, গড়তে পারেনি।

আত্মপ্রতিষ্ঠা যে আদর্শ শিক্ষা দেয়, আত্মবিলোপই কি তার শেষ পরিণতি?

বিলাসের মনে পড়লো তার বন্ধু রঞ্জন একদা বলেছিল, তোমাদের বিপ্লব শুধু নিজেদের কেন্দ্র করে। জনগণের মুক্তি তোমরা কোনদিন চাও না—তোমাদের শ্রেণীস্বার্থ তা চাইতে দেয় না।

মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থ!

রঞ্জনের বোকামিতে সেদিন ও হেসেছিল।

—তার মানে?

—মানে, তোমরা চাও তোমাদের মুক্তি। কিন্তু কান টানলেই যে মাথা আসে। তাই গণ-প্রেমের তিলক কেটে গণ-দেবতার পূজো কর।

প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি বলে সেদিন ও রঞ্জনকে বিদ্রূপ করেছিল।

আর আজ?—

: প্রত্যেকটি মুহূর্তের ভগ্নাংশ আজ বিলাসের মনে প্রতিক্রিয়ার বিষ ছড়াতে লাগলো।

স্বামীকে নিস্তব্ধ দেখে মালতী একটু বিস্মিত হলো। হয়ত ও আঘাত পেয়েছে, দুঃখ জেগেছে মনে।

—কী ভাবচ?

—ভাবনার কী অন্ত আছে মালতী। বিষণ্ণ হাসলো বিলাস।

—রাগ করলে আমার ওপর? মিনতিতে মালতীর কণ্ঠ এবার আর্দ্র হয়ে এল।—সব দেখে শুনে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাই তোমায় আঘাত দি। নইলে তুমি কী বোঝ না—

মালতীর কথাতেও মুখ তুললো না বিলাস।

—ওগো, শুনচো? কাছে এসে বিলাসের চুলে বিলি কাটতে লাগলো মালতী।—লক্ষ্মিটি, মুখ তোলো, চাও আমার দিকে।

টেবলের ওপর তেমনি মাথা হেঁট করে বসে রইলো বিলাস।

—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, অমন মুখ ভার করে থেকনা। এ আমি সইতে পারিনে—। বিলাসের মাথায় কপাল ঘসতে ঘসতে রুদ্ধ-কণ্ঠে মালতী বললে, কথা কও, কথা কও।

ধীরে ধীরে মুখ তুললো বিলাস।

—কি, বলো?

—কাঁদচো?

—না। আমরা কমিউনিস্ট্। দুখ্যু পেলেও আমাদের কাঁদতে নেই। ভেঙে পড়লেও আমাদের হতাশ হতে নেই। আমি কমিউনিস্ট্। বিলাস হাসলো।

মালতী বললে, একটি কথা আমার রাখবে?

—শুনি।

—ও নেকলেশটা তুমি বিক্রি করো। পরে না হয় আবার গড়িয়ে দিও। কিন্তু এখন—

বাধা দিয়ে বিলাস বললে, তা হয় না মালতী।

—কেন হয় না?

—স্বামী হয়ে এতোটা ছোটো আমি হতে পারবো না। স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে যা তোমায় দিতে পারলুম না, স্বামীর দাবিতে তা হরণ করবো? না, তা হয় না মালতী। ও অনুরোধ আমায় তুমি ক'রো না।

বিলাস আবার টেবলে মাথা নামালো।

একটু থেমে মালতী শুধালো, আচ্ছা, তুমি যেখানে যাও ওখানকার সব শ্রমিকই ত মিলে কাজ করে?

—নিশ্চয়ই। এত দুঃখেও বিলাসের হাসি এল, নইলে কী যাত্রা শোনে?

—না, সে কথা বলচিনে। আমি জিজ্ঞেস করি যে, মিলে কাজ করেও যদি ওরা ক্লাশ ষ্ট্রাগল্ চালাতে পারে, তাহলে তুমিই বা—

—তোমার কথা আমি বুঝেচি লতা। কিন্তু—

—কিন্তুর কী আছে এতে? বিলাসের উক্তির সমাপ্তি টানলো মালতী।

—ওকি, চুপ করে রইলে কেন? কথা কও।

বিলাসের চোখ দুটো কিন্তু তার আগেই সামনের খোলা বইটার একটি পাতার ওপর স্থিরনিবদ্ধ হয়ে গেছে। 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ অব নেচার' সম্বন্ধে এঙ্গেল্‌স্ লিখছেন—

"সমগ্র প্রকৃতি ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম বস্তু,—একমুঠো মাটি থেকে সূর্য,

আদিম প্রাণসত্তা থেকে মানুষ পর্যন্ত

সকলেই সর্বদা জন্মাইতেছে আর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

মুহূর্তে মুহূর্তে তাহারা পরিবর্তিত হইতেছে—।

প্রত্যেকেই নিরবচ্ছিন্ন গতিবেগ ও পরিবর্তনের আবর্তে ঘুরপাক খাইতেছে।……"

যে তরংগ তীর ভাঙে

(সুধীর দত্ত-কে)

বৈশাখ

১৩৩৭

কাহিনীর নায়ক-নায়িকা হইবার যোগ্যতা তাদের নাই : নিতান্তই অবহেলিত ভিক্ষুক মাত্র।

চৌরাস্তার মোড়ে সহরের বুকের উপরেই চাতাল ; চারিদিক ফাঁকা —মাথার উপর একটা ছাউনি শুধু।

সামনেই রাজপথ।

দিনের আলোয় বহুবার এ পথে যাতায়াত করিয়াছি, করিতে হয় বলিয়াই—কিন্তু কোনদিন ইহাদের দিকে লক্ষ্য দিই নাই, দিবার অবসরও হয় নাই : অতি সাধারণ। কেহ কেহ অবশ্য ভিক্ষার জন্য পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনার মতোই তাহা নির্বিবাদে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছি। কখনো উহাদের জন্য বিন্দুমাত্র কৌতুহল অনুভব করি নাই।

কিন্তু বিপর্যয় ঘটিল একদিন, অর্থাৎ একদিন রাত্রে।

বড়লোক বন্ধুর বউভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিতেছিলাম। রাত্রি হইয়াছে বেশ, শেষ বাসটা যদিবা আয়ত্ত করা গেল, কিন্তু বিপদ হইল এই যে বাসে উঠিতেই শুরু হইল বৃষ্টি, একেবারে সমস্ত আকাশ যেন ছিঁড়িয়া ফুটা হইয়া নামিল বর্ষণ। ছাতা আনি নাই, এবং ওয়াটারপ্রুফ নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠেনা।

সাসির ফাঁক দিয়া বাহিরের পানে চাহিতেই মনটা একেবারে দমিয়া গেল। বিরক্তি ও দুশ্চিন্তায় ভুক্ত আহার্য উঠিয়া আসিতে চাহিল। অগত্যা উৎসব বাড়ী হইতে সংগৃহীত একটা সিগারেট ধরাইয়া বোকার মত বসিয়া রহিলাম। চৌরাস্তার মোড়েই নামিতে হইবে, বাড়ি যাইতে হইলে হাঁটাপথ ওখান হইতে আধমাইলের কম নয়—ভিজিয়া যাওয়াও অসম্ভব। উপায় নাই কোনোদিকেই।

গন্তব্যস্থান আসিয়া পড়িল। সিগারেটটা শেষ হইয়াছিল—একটা বিড়ি ধরাইয়া নামিয়া পড়িলাম। কোনো মতে ঘাড় নিচু করিয়া, চোখ একেবারে প্রায় বুজিয়াই অবচেতন মনের ইংগীতে যেখানে আশ্রয় লইলাম সেটা সেই চাতাল। পাশ দিয়া ছাঁট আসিলেও মাথাটা বাঁচিল তো। রুমাল বাহির করিয়া ঘাড় গলা ভালো করিয়া মুছিয়া একটা থামে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলাম।

প্রথমেই লক্ষ্য পড়িল পারিপার্শ্বিকের পানে: না, ঘুমাইতেছে সকলেই। প্রকৃতির উচ্ছৃংখলতা তাদের মাঝে কোনো বাধাই সৃষ্টি করিতে পারে নাই। দুয়েকজন, যাদের দেহে জলের ছাঁট আসিবার সম্ভাবনা ছিল তারাও, বাহিরের দিকে পিছন দিয়া কাপড়ের খুঁটে সমস্ত দেহ ঢাকিয়া বেঘোরে নিদ্রা যাইতেছে।

ওদিককার দোকানগুলি সবই প্রায় বন্ধ, দুয়েকটার ভিতর হইতে আলোকের মৃদু রেখা বাহির হইয়া আসিতেছে মাত্র: বর্ষণের প্রাবল্যে তা অনেকটা অস্পষ্ট। ইলেক্‌ট্রিক্‌ পোষ্টগুলো দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে ক্লান্ত প্রহরীর মতো। একটা জায়গায় হয়তো তেল পড়িয়াছিল—ইলেক্‌ট্রিকের ম্লান আলোতেও তাহা ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিয়াছে।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম: পারিপার্শ্বিক আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকর্ষণ করিল। যার সহিত এতোদিন শুধু আপন সত্বাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াই দেখিয়াছি, আজ কেন জানিনা তার সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে ইচ্ছা হইল। যান্ত্রিক জগতের মানুষ, কিন্তু আজ সহসা ইহার সাথে একটা নাড়ীর যোগ অনুভব করিলাম। দিনের বেলায় যে-রূপ দেখিয়াছি,—এই বর্ষণমুখর রাত্রিতে, এমন স্তব্ধতায়, এমন একাকীত্বের আবেষ্টনীতে তারি নবতরো রূপের সহিত কোনো সামঞ্জস্যই

খুঁজিয়া পাইলাম না। একেবারে নতুন, অথচ অতি পুরাতন বলিয়াই মনে হইল।

ওই যে জল পড়িয়া সাপের মতো চিক্‌চিক্ করিতেছে ট্রামের লাইন-গুলি উহারাই বা আমাকে আকর্ষণ করিল কেমন করিয়া? মানুষেরই রক্তে বহুবারই হয়তো ইহারা লাল হইয়াছে, কিন্তু সব কিছু ভুলিয়া এমন রাত্রে ওই দূর-প্রসারিত ট্রাম-লাইনের দিকে চাহিয়া মনের মাঝে ভীরু পলাতক বৃত্তি জাগিয়া ওঠে কেন?

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু ভাবিতেই লাগিলাম; ভুলিয়া গেলাম স্থান-কাল, ভুলিয়া গেলাম গৃহের কথা।

চারিদিকের এই প্রেতস্বাপ্নিক নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া বর্ষণ চলিয়াছে অবিরাম: এর উপর যদি বিধাতার কোনো হাতই থাকে তাহা হইলে ইহাকে তাঁর নিদারুণ প্রতিশোধ স্পৃহা বলিয়াই মনে হয়। এই বর্ষণক্লান্ত নির্জন রাত্রে নিজেকে প্রেতের মতোই বোধ হইল: সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিতরূপেই এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার মধ্যে আবিস্কার করিলাম এক নতুন আমিকে। যার সন্ধান পাই নাই এতোদিন, আজ সহসা যেন সেই রহস্য জগতের দ্বার গেল উন্মোচিত হইয়া আমারই অন্তরলোকে। আমার এই সত্বার সংগে আমার যেন কতো চেনা, কিন্তু বিস্মৃতির মরুপ্রান্তরে আজ তা বিলুপ্ত। তবু অপস্রিয়মান স্বপ্নের মতো আমার মনের কোণে ইহার কয়েকটি ভগ্নাংশ হয়তো আজো অবশিষ্ট রহিয়াছে।

অন্ধের মতো অতীতের পাতা হাতড়াইতে লাগিলাম।

হঠাৎ একটা বিদ্যুত্ চমকাইতেই আত্মসচেতন হইয়া উঠিলাম। না, এমন নায়িকার মতো ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দার্শনিক চিন্তা করিবার সময় এটা নয়। কেননা, দার্শনিক হইতে হইলে

প্রচুর প্রস্তুতির প্রয়োজন, অনুকূল পরিস্থিতির দরকার। এ অধম নেহাৎই সাংসারিক চাকায় বাঁধা।

তার চেয়ে মিষ্টি কোনো কল্পনার রোমন্থন অনেক উপাদেয়। তাতে শুধু সময় কাটেনা, মনের ক্ষতেও প্রলেপ পড়ে।

সত্যি কথা বলিতে কি, স্বপ্নস্বর্গের কথা ভাবিয়া আত্মতৃপ্তির স্বাধীনতা যদি আমাদের না থাকিত, তা হইলে আমরা, অর্থাৎ এই নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবরা, এতদিনে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন্ হইয়া যাইতাম।

জানি, গৃহে আমার পুত্রকন্যারা হয়তো এখনো ক্ষুধার্ত জাগিয়া আছে, আমি পৌঁছিলেই পকেট হাতড়াইতে শুরু করিবে—যদি দু'টুকরা সন্দেশের সন্ধানও পায়। শ্রীমতী হয়তো জাগর-প্রতীক্ষা করিতেছেন,—যদি আজকের উৎসবরাত্রির মোহস্পর্শে আমার পুরাতন প্রেমিকটি প্রাণ পাইয়া তাঁকে কিছুক্ষণের মধুরতম সংগও দিতে পারে। কিন্তু সে-সব ভুলিয়া মনে পড়িতে লাগিল শুধু বন্ধুর কথা। কী করিতেছে এখন বন্ধু দম্পতি?

বাহিরের উৎসব উচ্ছাসের হল্লা নিশ্চয় এতক্ষণ শেষ হইয়া গেছে—উৎসব শুরু এখন তাদের ছোট ঘরটি ঘিরিয়া। ঘরটি কিন্তু ভারি ভালো। গল্পাদিতে ধনীগৃহের বিবিধ বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া থাকি বটে, কিন্তু সত্যিকারের ধনীগৃহ এই প্রথম দেখিলাম। সবুজ রঙ-করা দেয়াল, টেব্‌লের উপর ঝালর-দেয়া শেডের আড়ালে নীল আলো. ঝকঝকে বার্ণিশ করা আলমারি, আয়না, ড্রেসিং-টেব্‌ল। পুরু গদির দুগ্ধফেননিভ শয্যা একরাশ শিউলির মতো—শুইতে দ্বিধা জাগে, মায়া হয়।

বাহিরে এখন অজস্র বর্ষণ। ঘরে মাত্র একটি নারী ও একটি নর। দু'দিন আগেও যারা তৃতীয় পক্ষ ছিল, সামান্য একটা সামাজিক

বন্ধন তাদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। মনে করুন, যদি কোনো উলংগ পাশবাকাংখায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অশ্লীল রকমের অন্যায় করিয়াও বসে, তাহা হইলে শুধু সামাজিক কেন,—সরকারী কোর্টেও নালিশ চলিবেনা। ঢালাও স্বাধীনতা!

এ সব ভাবা পাপ। কারণ, এমন কিছু অবশ্য আমার বন্ধু করিবেন না। কেন না সে শিক্ষিত, সে ভদ্র, সে অভিজাত বংশীয়। এবং বন্ধুপত্নীও তদ্রূপ।

হয় তো কিছুক্ষণ নব পরিণীতার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বন্ধু বলিল,—তুমি, তুমি অসহ্য সুন্দর সুমিত্রা।

—যা-ও! মুখ ঘুরাইয়া আড়চোখে চাহিল সুমিত্রা।

—যাও নয়, সত্যি। সত্যি, তুমি হেভেন্‌লি!

তারপর কী করিবে বন্ধু? আল্‌তোভাবে হয়তো একটু আদর করিবে সুমিত্রাকে। অতি সাবধানে, নইলে সুমিত্রার অমন অপূর্ব প্রাসাধন, অমন সুন্দর সাজগোজ,—স-ব নষ্ট হইয়া যাইবে যে।

একসময় দুজনে গিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। সিল্কের ফুলকাটা পর্দা সরাইয়া জানালার পাট দিল খুলিয়া। জানালার কাঁচে লাগিয়া জলের শব্দ প্রথমে শুনাইতেছিল রিমঝিম, এখন ছাঁট আসিয়া লাগে সারা মুখে। শরীরে জাগে শিহরণ।

—মিত্রা!

—উঁ!

—কথা বলো।

—কী বলবো?

—যা ইচ্ছে। যা-তা সব কথা। অর্থহীন সব কথাও আজকের রাতে অপরূপ হয়ে উঠবে সু।

—তুমি বলো।

—না তুমি। সারাদিন তো সকলের ভিড়ে চোখে চোখে কত কথা কয়েচো। এখন তোমার স্বরের সুধায় আমায় ভরে দাও।

কবিতার যতির মতো কয়েকটি মুহূর্তের মৌনমধুর কাকলি।

—কতক্ষণ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে মিতা?

—অ-নে-ক-ক্ষ-ণ। সুরেলা গলায় সুমিত্রা উত্তর দেয়।

এরপর সুমিত্রা একটু সরিয়া আসে, অথবা বন্ধুই হয়তো তাকে একটু কাছে টানিয়া লয়।

—এমন ক'রে জলের ছাঁট নেয়না। অসুখ করে।

—অসুখ! আবেগে বন্ধুর গলা কাঁপিয়া যায়—'সার্সিতে জলসারেঙ্ বাজে, পথ আজি নির্জন—'

তারপর? তারপর ভুলিয়া গিয়াছি।

এই আত্মকেন্দ্রিক একাগ্রতা হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

ওপাশ হইতে কে যেন কাহাকে আহ্বান করিতেছে নিম্নস্বরে ফিরিয়া চাহিলাম: গ্যাসের আলোয় মেয়েটিকে দেখা গেল,—কাহাকে যেন ঠেলা মারিয়া ডাকিতেছে।

কৌতুহল হওয়াই স্বাভাবিক, চোখ ফিরাইতে পারিলাম না।

ম্লান আলোয় মনে হইল বয়স তার কুড়ি,—একুশই হয়তো হইবে, তার কিছু কম বা বেশী হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। সবচেয়ে বিস্ময় লাগিল এবং লিখিতেও লজ্জা হয়, তাহার দেহের দিকে চাহিয়া: আবরণ বলিতে মাত্র কাপড়খানা কোমরের সাথে জড়াইয়া রহিয়াছে কোনোমতে —সমস্ত শরীর তার উলংগ। একা ঘুমন্ত লোকের মাথাটা লইয়া নিজের উন্নত বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া সে ডাকিতেছে, ছিমন্ত, এ্যাই ছিমন্ত—

ইহার পর আর এখানে থাকা চলে না, চলিয়া যাওয়াই উচিত। কিন্তু পা দুইটা সহসা অচল হইল কেন? একী আমার অন্তরের অবরুদ্ধ পাশববৃত্তিরই প্রকাশ,—না আজকের রাত্রির সহিত ইহার কোনো সংযোগ রহিয়াছে? যন্ত্রচালিতের মতো ওদের চোখের অন্তরালে একটা প্রায়ান্ধকার পরিবেশে আশ্রয় লইলাম।

লোকটির ঘুম ভাঙে নাই।

মেয়েটি ডাকিতেছে, এই ছিমন্ত, ছিমন্ত, দ্যাখ্ না—। তাহার মাথাটি ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে মেয়েটি নিজের দেহের দিকেও একবার তাকাইয়া লইল: চোখটা তার দেখা যায় না!

ডাকাডাকিতে ছিমন্তের ঘুম ভাঙে। চোখ মুখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলে, কে?

মেয়েটি তখন একটু দূরে সরিয়া গিয়া দু'হাতে নিজের বুকটা আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছে। ছিমন্ত এবার একটু সচকিত হইয়া ওঠে। বলে, আমারে ডাকছিলি সুখী?

সুখীর কথা শুনিতে পাইলাম না—শুধু দেখিলাম সে ঘাড় নাড়িতেছে এবং হঠাৎ মাথাটা সে নিজের কোলের মধ্যে গুঁজিয়া ফেলিল।

ছিমন্তও একটু আলস্য ভাঙিয়া তার দিকে সরিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, কতক্‌খন থিকে বিষ্টি হইচে রে, অ্যাঁ?

—অ-নে-ক-খ-ন। বেশ টানিয়া টানিয়া সুখী উত্তর দিল। কিন্তক কী ঘুম রে তোর—ডাকলেও সাড়া পাই না? সারাদিন খালি বকবক, অথচ............তোর ঘা'টা কেমন আছেরে ছিমন্ত? ঘুমুলেও টন্‌টন্ করে, হ্যাঁ রে? বলিতে বলিতে সে একেবারে ছিমন্তের গা ঘেঁসিয়া আসিল।—সব ঘুমাইচে, লয়রে?

সুখীর প্রশ্নে ছিমন্ত একবার চারিদিকে চাহিল। হঠাৎ আমার

দিকে লক্ষ্য পড়িতেই হাঁকিল, কে হোথায় ?

কোনো উত্তর দিলাম না,—তাড়াতাড়ি বৃষ্টির মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলাম : ঘাড়টা একেবারে মাটির দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

নিতান্তই সাধারণ—চিরন্তনী। নূতনত্ব নাই এবং গল্প লেখাও হয়তো যায়না ইহা লইয়া।

মনে রাখিবার মতো তো নয়ই।

কয়েকদিন পরের কথা।

আপিসের বেলা হইয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি আসিয়াও নিয়মিত বাস পাইলাম না—দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল সেই চাতালটারই কাছে। কেন জানিনা, নেহাৎ কৌতুহলের বশেই হয়তো লক্ষ্যটা সেইদিকে গিয়া পড়িল—মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল একটি বিগত রাত্রির কয়েকটি দৃশ্য : সত্য বলিয়া ভাবিতেও আজ দ্বিধা হয়।

হঠাৎ দেখিলাম সেই ছিমন্তই ছুটিয়া আসিতেছে আমার দিকে, পিছনে পিছনে মেয়েটিও। ভয় হইল : চিনিতে পারে নাই তো! তাহা হইলেই তো মুস্কিল। শংকিতভাবে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিলাম।

ছিমন্ত ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে।

—বাবু একটা পয়সা।

একটু দূর হইতে মেয়েটি হাঁকিল,—না বাবু, আমাকে—

—তোকে ? ছিমন্ত খিঁচাইয়া উঠিল, তোকে দিবে ক্যান্‌রে ? অমন জলজ্যান্ত পা'দুটো থাকতে ? আর আমার—ছিমন্ত নিজের খঞ্জ পা'টার দিকে কাতর চোখে চাহিল।

মেয়েটি, অর্থাৎ সুখী এতোক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। ছিমন্তকে

একরকম প্রায় ধাক্কা দিয়াই কহিল, ওঃ! কী আমার আল্লাদিরে! এক পায়েতেই বারো মুল্লুক জয় করে বেড়ান. তার আবার—না বাবু আমায় দিন, আমি ম্যাছেলে। সুখী করুণ করিয়া হাসিল।

প্রতিবাদে ছিমন্তও রুখিয়া দাঁড়াইল।

পয়সা পাইবার পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হাতাহাতি লাগিয়া যায় দেখিয়া নিজেকে রীতিমতো বিপদগ্রস্ত মনে করিলাম। নিতান্তই অনিচ্ছায় একটা আনি ছুঁড়িয়া দিলাম উহাদের দিকে। মৃত জানোয়ারের উপর শকুনিদের দল বাঁধিয়া আড়াআড়ি করিয়া ছোঁ মারিতে দেখিয়াছি। আজো দেখিলাম তারই রূপান্তর। একটা আনির জন্য কী ধস্তাধস্তিই না চলিল দুজনের। রাস্তার উপরেই উভয়ের হুটোপুটি লাগিয়া গেল। আমি বিমূঢ়!

হাজার হইলেও ছিমন্ত পুরুষ—শারীরিক শক্তি তারই বেশী: আনিটা পাইল সেই। উল্লাসে সে চেঁচাইয়া উঠিল: তার কুৎসিৎ ফোকলা দাঁতের ভিতর দিয়া পরম সার্থকতার হাসি গড়াইতেছে।

ব্যর্থতায় ও অপমানে সুখীর চোখেমুখে তখন আগুন জ্বলিতেছে। এক মুহূর্ত সে কী ভাবিয়া লইয়া সহসা সজোরে ছিমন্তের হাত কামড়াইয়া ধরিল: যে হাতে আনিটা আছে।

বিকট যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল ছিমন্ত। আবার পরস্পরের ধস্তাধস্তি,—আনিটা গড়াইয়া পড়িল রাস্তায়।

সুখীর লক্ষ্য নাই সেদিকে,—প্রতিশোধ লইয়া সে ধীরে ধীরে চলিল চাতালের দিকে। সমস্ত দেহটা তার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ছিমন্ত অবিরাম গালি পাড়িয়া চলিয়াছে—সেই সাথে করুণ কাতরোক্তি। রক্তাক্ত ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সেও সুখীর পিছন পিছন চলিল খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে।

আমার মুখে কথা নাই : একটা বাসতো ছাড়িয়াই দিয়াছি।

ভাবিতে লাগিলাম : কোনটা সত্যি, সেদিনের সেই বর্ষণমুখর রাত্রি, না আজকের এই উজ্জ্বল সকাল ?

কিন্তু দার্শনিক চিন্তা করিবার সময় এটা নয়।

বাস আসিতেই পরিত্যক্ত আনিটা কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

ফাল্গুন
১৩৪৭

গদ্যকবিতা

(হাম্বীর বসু-কে)

সশব্দে কপাট দুটো এক হয়ে গেলো।

উন্মুক্ত পথের ওপর এসে দাঁড়ালো ও। চেতন-অবচেতনের সংঘাতে সমস্ত মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

পেছন ফিরে তাকালো একবার বাড়িটার দিকে : নিরেট নিটোল স্তব্ধতা বন্ধ কপাট দুটোর ওপর।

তেইশটি বছরে প্রথম অংকের শেষ।

সামনে সীমাহীন পথ সাহারার মতো। পা বাড়ালো।

মেঘলা ভোর। দিনের শুরু। ধূসর চাঁদোয়ার মতো ভেজা ভেজা কুয়াশার আস্তরণ ঝুলছে কলকাতার মাথায়। এখানে-ওখানে দু'একটি লোকের মন্থর পদক্ষেপ। কর্পোরেশনের গাড়িগুলোর সশব্দ বিহার। ইতস্তত চায়ের দোকানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

গলির শেষে রাজপথ। কোন্ পথে যাবে? পূবে, না পশ্চিমে? বিষাক্ত সাপের মতো ঠাণ্ডা পিচের পথ এঁকে বেঁকে বাঁক ঘুরেছে পশ্চিমে।

ও ফিরলো।

মনে অসংখ্য ভাবনা। কিন্তু কী আছে ভাববার? বিক্ষিপ্ত নীহারিকার মতো ছেঁড়া ছেঁড়া অযুত চিন্তা। (বিগত রাত্রি? তাইতো সবটুকু নয়,—ওতো ধিকিয়ে-ধিকিয়ে-জ্বলা অনেকগুলি বিস্ফোরক রাত্রির চকিত বিস্ফোরণ মাত্র।)

দোষ!

না, বাবারো দোষ দেয়া যায় না। মা'য়ের জন্য দুঃখ হয়। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না-পেরে ভাইবোনগুলি যদি ভব্যতা ছাড়ায়, নালিশ

জানিয়ে তাহলে লাভ কী?

অভিযোগ!

কার ওপর? নিজের অকর্মণ্যতাকে অভিশাপ হয়তো দেয়া চলে, তবু তা প্রতিরোধের সাধ্য তার কোথায়?

বাবা অভিশাপ দিলেন! স্বাভাবিক। সোনার স্বপ্ন তাঁর ভেঙে গেলো। (সোনার স্বপ্ন! কার?)

উদার আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে উর্ধে চাইলো। সূর্য! কোথায়? নগর সৌধের অন্তরাল হতে সূর্যের সংকেত এখনো আসেনি।

একটা চায়ের দোকান।

—আসুন। লোকটা পেশাদারী করুণ হাসলো। কী শীর্ণ পাণ্ডুর চেহারা! ঘুমের বীভত্‌সতা নিয়ে একরাশ খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁপ।

সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় সংকুচিত হয়ে আসে। একমুহূর্ত থেমে ও বড়ো বড়ো পা বাড়ালো।

—পাগল নাকি? অ্যাঁ!

(পাগল? হায়রে!)

সেই একঘেয়ে সূর্য। কুয়াশাচ্ছন্ন সম্ভাবনার স্বপ্ন বিপর্যস্ত।

পৃথিবীর প্রথম থেকেই ওটা ওইরকম পূব-পশ্চিম করছে নাকি? বৈচিত্রহীন, ক্লান্তিহীন, পংগু পরিক্রমা।

পিপাসা পেয়েছে। চায়ের পিপাসা। ক্ষুধা? না, ক্ষুধাকে দমন করতে পারে। কাল রাতেই না-হয় পেটে কিছু পড়েনি। (কাল রাত!)

পকেটে হাত দিলো। অবলীলায় আঙুলগুলো পকেট ভেদ

করলো। (জামাটাই শুধু ফর্সা!)

একটু এগোলেই হয়তো রমাকান্তর বাড়ি পাওয়া যাবে। অনেক দিনের বন্ধু রমাকান্ত। চাকরী করে, বাবার মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে, বিধবা মাকে দেশ থেকে এনে বাড়ি ভাড়াও করেছে কলকাতায়। কী চমৎকার গুছিয়ে নিয়েছে। নিস্তরংগ হ্রদের মতো শান্ত জীবন। উচ্ছ্বাস নেই, প্রাণ আছে। গতি নেই, অস্তিত্ব আছে। (বে-শ লাগে! সত্যি, ভাবতেও ভালো লাগে!)

তবে নেহাত্ গতানুগতিক, ওর মতো বিদগ্ধ প্রাণ নয়। রমাকান্ত ওকে ভালোবাসে, হয়তো সেটা শ্রদ্ধা। যেতে অনুরোধ করেছিলো সেবার, ঠিক অনুগ্রহ ভিক্ষার মতো। যাবে নাকি আজ? খুশি হবে নিশ্চয়ই। (চায়ের পিপাসাটাও ভীবণ!)

একটা খোয়া-ওঠা গলির শেষে রমাকান্তর বাড়ি।

—কাকে চান?

—রমা বাড়ি আছে? রমাকান্ত? শ্রীরমাকান্ত—

—ও বাবা? হ্যাঁ, আছেন। আপনি কোত্থেকে আসছেন? কী নাম বলবো? একনিঃশ্বাসে ছেলেটি প্রশ্ন করে যায়। বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি তো! ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলের মাঝে পাত্লা ঠোঁটের অভিব্যক্তি ভা-রী সুন্দর।

রমাকান্ত বের হয়ে আসে। ওকে দেখে একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

—আশ্চর্য! এ্যাদ্দিনে তবু মনে পড়লো?

অবাক্ হয়ে ও পর্যবেক্ষণ করে। ওর মা তাহলে মারা গিয়েছেন। সমস্ত চেহারায় সেই শোকের চিহ্ন দেদীপ্য।

—সব শুনেচিস নিশ্চয়? ভাঙা ভাঙা স্বর রমাকান্তর।

—হ্যাঁ, অপরাধী গলায় ও বলে, হ্যাঁ, শুনলুম মোহিতের কাছে।

—মোহিত! মোহিত জানে নাকি? বিস্ময় প্রকাশ করে রমাকান্ত।

—মোহিত না কে যেন বলছিলো। তাড়াতাড়ি ও-প্রসংগ চাপা দেয়, তা কদ্দিন হোলোরে?

—ন'দিন। বসবি নে তুই একটু?

—সময় নেই ভাই। আশ্চর্য ব্যস্ততা এনে বলে, শুনেই এলুম দেখা করতে। কাজের যা ভিড় পড়েছিলো—

—মা'র মৃত্যু সত্যি আমায় একেবারে ভেঙে দিয়েছে ভাই। পাশে চলতে চলতে রমাকান্ত বলে, এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারিনে, যে মা নেই! টপটপ করে রমাকান্তর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

প্রবোধ দেয়া ওর পেশা নয়। অশ্রু দেখলে অশ্রু ওর জমাট বাঁধে। খালি কান্না আর কান্না, উপন্যাসের নায়িকারো অধম! মানে হয় না এ-হৃদয়দৌর্বল্যের।

রমাকান্তরো বিরাম নেই। মা'র মৃত্যুর আনুপার্বিক ইতিহাস বলেই যেন ছাড়বে। (ভালো লাগে এমন করে কাঁদুনী গাইতে! ঢাক পিটিয়ে নিজের দুর্বলতাকে এমন করে জাহির করতে পৌরুষও কী আহত হয় না! অসহ্য!)

—আজ তা'লে আসি, মানে, একটু দরকার আছে। বিশেষ আমতা আমতা করে ও কথাগুলি বলে, পারি তো কাল-পশু না-হয় একবার—

—যাবি? একমুহূর্ত থামলো রমাকান্ত, একটা কথা ছিলো ভাই—

নাঃ, এমন অভদ্ররকম কিছু আশা করেনি নিশ্চয়ই। রমাকান্ত

যে অমন হুট করে কয়েকটা টাকা চেয়ে বসবে এ তার ধারণারও অতীত ছিলো। কী ভেবেছ ওকে? সন্তোষের অংশীদার, না বিড়্লার পার্টনার?

অপমান!

না, অপমানের অবিশ্যি ও কিছু মনে করেনি। একটা বড়ো রকমের আশা নিয়েই ভিক্ষে জানিয়েছিলো রমাকান্ত। কিন্তু ও-ইঁবা কেমন, যে সরাসরি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলো?

আজ বিকেলেই টাকা চাই রমাকান্তর। নইলে মায়ের তার শ্রাদ্ধ হবে না।

শ্রাদ্ধ হবে না! কেন, কী হয় না হলে? যে মরে বেঁচেছে তাকে একেবারে চতুর্দোলায় করে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে তার আত্মা শান্তি পাবে না। (আত্মা! শান্তি! বেঁচে থেকেই সারাজীবন যে-শান্তি তিনি পেয়ে গেছেন!) জানে তো ও সব: গংগাজল ছাড়া ওষুধ জোটেনি। আর এখন—ননসেন্স্!

স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে বা বাঁধা দিয়েও স্বর্গের একখানা পাশপোর্ট তাঁকে জোগাড় করে দিতেই হবে। (স্বর্গ! বারোয়ারী শান্তিনিবাস! স্টুপিডিটি!)

কক্খনো টাকা দেবে না। একটা আধলাও দেবে না। মনে মনে একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলো।

পার্ক।

কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে। হয়তো উত্তেজনায়। কিম্বা পথশ্রমে। বাঁ হাতের তালু দিয়ে কপালটা টেনে মুছে নিলো। বেলা ক'টা হবে? ন'টা? পার্কের ঘড়িটা সূর্যের আলোয় ঝক্ঝক্ করছে। স্পষ্ট

দেখা যায় না।

একটু বিশ্রাম? লক্ষ্য যখন নেই, চলাটাকে তখন কিছুক্ষণের জন্য মূলতুবি রাখতে দোষ কী? (চলতে তো হবেই,—গোটা জীবন, অশেষ পথ!)

রবিবার।

বেশ ভিড়। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েই বেশী। বাকি বুড়োর দল। বেঞ্চে বেঞ্চে চণ্ডীমণ্ডপ। পুকুরের ওপর সূর্যের ঝিলিমিলি। গাছের মাথায় ছিটকে-পড়া সূর্যের ভগ্নাংশ। কষ্টিউম্ পরে ছেলেরা ডাইভ দিচ্ছে। ওদিকে একটা ঘাটে বেশ লোক জমেছে। খই ছোঁড়া হচ্ছে জলের ওপর। উচ্ছ্বসিত কলহাস্য। মানুষের খেয়ালী আনন্দে পশুর আহার্য-জীবিকা। (বেনে মাড়োয়ারীও কর্মচারীর মাইনে কেটে পিঁপড়ের গর্তে চিনি ছড়ায়—পুণ্যার্জন!)

এ-পাশে রাস্তায় ট্রাম-বাস-মানুষের ছন্দহীন মিছিল। অর্থহীন শব্দতরংগ প্রলাপ তুলেছে হাওয়ায়। রেলিঙের ওপর রঙবিরঙের ছবি টাঙানো, রাস্তার দিকে মুখ করে। ওপারে রঙের বৈচিত্র, এপারে শাদার বৈধব্য। (ঠিক জীবন: সম্মুখে মরীচিকা, পিছনে মরুভূ।)

—ওর প্রেমকে তুই অস্বীকার করতে পারিসনে?

স্বরের আন্তরিকতায় পাশ ফিরে চাইলো। দুটি ছেলে এসে বসেছে। ঘাড় নামানো চুল, চোখে রিম্‌লেশ, পাণ্ডুর মসৃণ কপোল, শীর্ণ চেহারায় পোষাকী বংশাভিজাত্য।

—তুই হয়তো সেদিন ইনষ্টিউটে শচীবিলাসের সংগে ওর হাসাহাসির কথাটাই ভাবচিস, মোসাহেবি গলায় সেই ছেলেটিই আবার বললে, কিন্তু শচীবিলাসের বাপের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কত্তো শুনি? ডিগ্রিগুলো ধুয়ে

কি খাবি খাবে আজকালকার বাজারে? কটা পার্টি দিতে পারে যে মিস সেইনের সংগে—

—থাম ভাই, দ্বিতীয় ছেলেটি করুণস্বরে বললে, ছেড়ে দে ওসব কথা।

—আচ্ছা, না-হয় ছেড়েই দিলুম। রাজ্যত্যাগের ভংগিতে কথাগুলো উচ্চারণ করলো, কিন্তু সেদিনকার বোটানিকে জয়রাইডের দৃশ্যটাও একবার মনে কর। আমি পেছনের সিটে না থাকলে মণিকা সেদিনই তো সারেণ্ডার করেছিলো।

যুক্তির অকাট্যতায় ব্যর্থপ্রেমিক বন্ধু চুপ করে রইলো।

—কালই য়ুনিভারসিটিতে তুই একবার মণিকার সাথে দেখা কর। তারপর সন্ধের দিকে না-হয় আরেকবার কাফে-ডি-মণিকোয়,—

—দেখি। আস্তে আস্তে তরুণ বাঙলা সায় দিলো।

—শুধু দেখি না, সেই সাথে এও জানিয়ে দিবি যে, তোর বাবা রায়গঞ্জের জমিদার আর শচীবিলাসের বাপ তাঁরই নগণ্য প্রজা। ফুঃ—

আগামী জমিদার সোনার সিগারেট কেস বের করলো।

—আর, একটু থেমে হঠাত্ দার্শনিকের সুরে বন্ধুটি বললে, সব জিনিসেরই একটা দ্বৈতরূপ আছে। ফিলজফির ছাত্র হলে কথাটা আর তোকে বলতে হতো না। যেমন, মানুষের মধ্যেকার সত্যিকার প্রেমিকটি চিরশুচি, ব্যাভিচারী সে কখনো হয় না। এই ধর না আমারি কথা, আমার প্রেমিক আমিটি সর্বদাই একনিষ্ঠ, কিন্তু আমার ব্যবহারিক আমিটাই করে মধুপবৃত্তি, ফ্লার্টিং—নিছক জৈবিক তাড়নায়। তোর ঐ গোটা বৈষ্ণব ফিলজফিই—

উঃ! একটা যুগান্তকারী প্রতিভা না হলে পরাধীন দেশের পার্কে এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয় না। ধন্য, ধন্য তুমি রত্নগর্ভা য়ুনিভার্সিটি! শ্রদ্ধায়

ওর মাথাটা হাঁটুর কাছে এসে ঠেকে। (দুঃখ হয়, অধ্যাপকরা হাতে বই নিয়ে ক্লাস করে কেন, চাবুক আনতে পারে না? চাবুক!

—চল্, এবার ওঠা যাক।

—চল্। একবার ইম্পিরিয়েলটা ঘুরে গেলে হতো না?

—এখন?

—মন্দ কী? লাঞ্চের সংগে জমবে ভালো।

অভিসারের ছন্দে দুজনে পার্ক থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

ওর শরীরের পেশীগুলো বৃথাই সংকুচিত হতে লাগলো কয়েক মিনিট। (হে আমার স্বর্গত আত্মা! আশীর্বাদ করো, আশীর্বাদ করো: রক্তকে শীতল করো, সংযমকে সীমাহীন করো।)

হঠাত্ পাশে খালি বেঞ্চটার ওপর নজর পড়লো। একটা মনি-ব্যাগ! চমকে উঠলো ও।

বন্ধুদ্বয় দৃষ্টির বাইরে!······

হাতটা কেঁপে গেলো একবার। এর অধিকারীদের খুঁজবে কোথায়?

কিন্তু কি ভারী এটা!

আর দেখতে কী ডিসেণ্ট! (পাকস্থলীতে আলোড়ন······)

হনহন্ করে ও হাঁটতে শুরু করলো।

নীতি!

নীতিই ভণ্ডামী। আর যদি সত্যিও হয় তাহলেও জীবিকার্জনই সবচেয়ে বড়ো নীতি, যেমন করেই হোক। নীতির দোহাই দেয় তারা অনৈতিকতার গদীতে আসন যাদের বনিয়াদী। চুরির বিচার করে সেই বিচারক মাসিক যার হাজার টাকা মাইনে বরাদ্দ। নিজের মিথ্যার ভয়ে সত্যের জয়ঢাক পিটায় চরম মিথ্যাবাদী। যত সব

বুজরুকি! ওদের কারো বৃদ্ধ বাবা অন্তিম দারিদ্রে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় না, মা'র শীর্ণ মুখ দেখতে হয় না, ক্ষুধাক্লান্ত অপোগণ্ড ভাইবোনের আর্ত কলরব শুনতে হয় না।

প্রায় পনেরো মিনিট একটানা চলে অবশেষে থামে। উত্তেজনায় সমস্ত বুক দুরদুর করছে। পকেট থেকে আস্তে আস্তে মনিব্যাগটা বের করে।

কয়েকজন মজুর শ্রেণীর লোক একটা তালা-আঁটা বাক্স নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—কেয়া মাঙতা?

—কুছ মেহেরবানী বাবুসাব। মধ্যবয়সী একটি লোক অমায়িক হেসে সামনে বাক্সটা মেলে ধরলো, চারো তরফ ষ্ট্রাইক শুরু হো গ্যয়া, ভুঁখা মর রহে মজদুর ভাইয়োঁ।

—তোমার মজদুর ভুখা মরে তো আমি কী করবো? খেঁকিয়ে উঠলো ও। —ভাগো।

—আপলোগ যব মদত্ নেহি দেঙ্গে তব ইয়ে আজাদী কী লড়াই—

—আজাদী তো হামার কেয়া? মনিব্যাগটা পকেটে রেখে ও পা বাড়ালো।

—কেয়া বুরি বাত! বিস্ময়ে ফেটে পড়লো মজুরটি, আপভি হিঁদুস্তানী, হিঁদুস্তানকা শহীদ। ইস্কি আজাদী আপ নেহি মাঙতে হেঁ?

(হিঁন্দুস্তানী! হিঁন্দুস্তানের শহীদ! ওর বাবা, চায়ের দোকানি, রমাকান্ত, ও নিজে, য়ুনিভার্সিটির রত্নদ্বয়—আর অশিক্ষিত জঘণ্য মজুরগোষ্ঠী। হিঁন্দুস্তানের শহীদ!)

—চমৎকার! ওর হাসি পেলো।

—ইয়েভি সোচিয়ে—

(লোকটা ভালো করে কথাও বলতে পারে না।)

হঠাত্ ও উত্তেজিত হয়ে উঠলো, দেশে তো কতলোক না খেতে পেয়ে মরছে, আমি তার কি করবো শুনি?

—ইসি বাস্তে তো লড়াই হোবে বাবু, অন্য একজন বললে অটল বিশ্বাসে, লড়াইতে আজাদী মিলবে। আজাদ হিঁন্দুস্তানমে কোই ভুখা নেহি রহেগা।

(হে ভারতের দেবদেবি! শোনো, তোমার পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে অমৃতের পুত্ররা আজ ভিক্ষে চায় আজাদীর জন্যে! আশ্চর্য! ক্ষুধার্ত মানুষ খেতে চায়, তবু তোমায় চায় না! আশ্চর্য! অভিশাপ দাও, অভিশাপ দাও—)

—আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো! এবার ও জ্বলে উঠলো, ভিক্ষে করে লড়াই চালাবে? আজাদী আনবে? কেন, দেশে কি অভাব আছে কিছুর? খেতে পায়না, তাই লড়াই চালাবে! খেতে না পেলে অমন লড়াই সবাই চালায়। কেন, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাতে পারোনি? কিম্বা কোনো প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির ব্যাঙ্কে যার অগাধ ব্যালান্স? তাহলে আর লড়াই-এর খই মুখে ফুটতো না, নাকি সুরে প্রেমের নতুন ব্যাখ্যা দিতে, শিকড়হীন সাহিত্য সৃষ্টিতে দেশে প্রগতি আনতে, রুমালে চোখ মুছে দেশসুহৃদ আখ্যা পেতেও দেরী হতো না। তারপর বুড়ো বয়সে আশ্রম খুলে, ভারতীয় ঐতিহ্যের অবিনশ্বর বিভূতি মেখে, শাশ্বত সত্যের শুকনো হাড় চিবিয়ে, যোগের ভণ্ডামীতে মানসিক ডিগবাজী খেতে পারলেও হইচই পড়ে যেতো দেশ-দেশান্তরে। পইপই করে পংগপালের মতো ভিড় জমাতো সমধর্মী জারজের দল।

—তা নয়, শুধু ভিক্ষে, ভিক্ষে! কেন জোর করতে পারো না?

—টুঁটি টিপে নিজের বাঁচবার অধিকার ছিনিয়ে আনতে পারো না ?

—তা নয়, ভিক্ষে, ভিক্ষে ! হাত পাতলেই অধিকারের মেওয়া টুক করে ঝুলে পড়বে। আহাম্মকের দল !

রণক্লান্ত কুকুরের মতো ও হাঁপাতে লাগলো।

মজুরেরা স্তব্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে থাকে।

—আরে, তুই ? এখানে কী করছিস ?

বিমান, অনিলেন্দু, প্রবীর।

—এই, হাটো সব। বিমান ছিনিয়ে আনলো অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ থেকে।—কি ব্যাপার বলতো ?

—কিছু হেল্প্ চাইছিল। ও আস্তে আস্তে বললে।

—খবর্দার, খবর্দার দিসনি। বিমান বললে, এ-এরিয়াটা অন্য পার্টির।

—কিন্তু দিয়ে দিয়েছি যে। অবলীলায় মিথ্যেটা বললে।—আহা ! সব না খেতে পেয়ে মরছে।

—কিন্তু, গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে অনিলেন্দু, বিরুদ্ধ পার্টিকে সাহায্য করা মানে শত্রুকে বাড়তে দেয়া। আমরাও তো সেদিন তিন তিনটে ষ্ট্রাইক অর্গানাইজ করেছি, কিন্তু—

যেন কতবড়ো একটা অপরাধ করে ফেলেছে, এমন সংকুচিতভাবে পথ চলতে লাগলো।

—ছেড়েদে ওসব কথা। এ্যাদ্দিন ছিলি কোথায় ? আর, এখন যাচ্ছিসই বা কোথায় ?

— মহালের বাকি খাজনাগুলো 'একটু...মানে......

—বুঝেচি। তারপর, যাওয়া হচ্ছিল কোথায় শুনি ?

—সাদার্ণ এ্যাভেন্যু, অর্থাত্ মামার বাড়ি।

—তাও বুঝলুম। বিমান রহস্যময় হাসলো, ওখানে বিকেলে যাস,

একেবারে লেইকে সান্ধ্য ভ্রমণটাও সেরে আসবি। এখন আয় আমার বাড়ি। অনেক দরকার তোর সংগে।

বিমান হাত ধরলো।

শিয়রে মার্ক্সের ফটো, এপাশে লেনিনের ওপাশে ট্রট্স্কির। চারদিকে আলমারী ভর্তি বই, ইতস্তত ছড়ানো বই টেবলে-বিছানায়, তিনচারটে কাপ, সিগারেটের টুকরো, বাসি রজনীগন্ধা—আরো কতো কী।

সমস্ত ঘরটা ঘিরে এক সুনিয়ন্ত্রিত বিশৃংখলতা।

চেয়ারে বসে একটা বই তুলে নিলো। *The Proletariat Revolution and Kautski the Renegade* ; আলগোছে আবার নামিয়ে রাখলো।

—পড়েছিস ?

—না।

—সেকী! চমকে উঠলো বিমান, প্রত্যেক ইন্‌টেলিজেন্সিয়ার যে এটা পড়া দরকার। রিয়েকৃশনারী পেতি বুর্জোআ-কে ড্যাস্ করার যে কী ক্ষমতা ছিল লেনিনের এখানা পড়লেই তা বোঝা যায়।

—Exactly। সায় দিলো অনিলেন্দু।

সোৎসাহে প্রবীর বললে, এর বাংলায় অনুবাদ হওয়া উচিত। আমিই করবো ঠিক করেচি।

—হয়ে গেছে।

—হয়ে গেছে! হতাশা ঝরে পড়লো তার স্বরে।

—যাক, ছেড়ে দাও ওসব কথা। বিমান বললে, let us come to the point. হ্যাঁ, আমরা একটা পত্রিকা বার করচি, নাম 'ফুলকি'। It will be unique in character. দু'বেলা ধর্মতলার ষ্টলে যেসব

পত্রিকা দেখিস, সেরকম নয়। এর ভেতর দিয়ে আমরা leftist literature preach করবো।

—এতো ভালো কথা। অস্ফুটস্বরে ও বললে।

—দেশের সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। art for art's sake-এর সবারির দিন শেষ হয়েছে। তাই আমাদের পত্রিকার একটা বিশিষ্ট political tone থাকবে, আমাদের সাহিত্য প্রাণ দেবে দেশের অগণিত বুভুক্ষু জনগণকে, দেবে নবীন আদর্শের দ্যোতনা। ট্রট্স্কির ভাষায়—

বিমান কথা বলতে লাগলো। কী সুন্দর আর সাবলীল তার বলবার ভংগি! কী মার্জিত তার ভাষা! মজুরদের প্রাণের কথা, তাদের আশা আকাংখার কথা, কোন মজুরই হয়তো এমন করে বলতে পারে না।

সবাই মত প্রকাশ করে, কথার মোড় ঘোরায়, ও শুধু ঘোরায় মাথা। সাহিত্য থেকে রাজনীতি, তারপর ধর্মনীতি ও সমাজনীতি, কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট্, ঐতিহাসিক জড়বাদ আর গ্লাস্ অফ ওয়াটার থিয়োরী, সর্বহারার বিপ্লবে বুদ্ধিজীবির ভূমিকা এবং বুর্জোআ সংগ্রামে সর্বহারার স্থান, কাউটস্কী ও কে-একজন ভারতীয় রায়—এমনি কতো প্রসংগ। ও নির্বাক হয়ে শোনে। বোঝে না সব, কিন্তু বেশ লাগে শুনতে।

—আজকে শিল্পীর দায়িত্ব তাই অনেক। সাম্প্রতিক রাষ্ট্রিক কাঠামো যখন ডায়ালেক্‌টিক্‌স্-এর অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বে ভাঙনের উপকূলে এসে দাঁড়িয়েছে, শ্রেণী সংগ্রাম যখন আমন্ত্রণ জানিয়েছে নতুন সূর্যকে, তখন শিল্পীকে আর শেষ রাত্রির স্বপ্নে মশগুল থাকলে চলবে না।

deafitist mentality-কে পরিহার করে, সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়ে, জনতার মাঝে গাইতে হবে জীবনের জয়গান,—প্রাণধর্মী বলিষ্ঠ আদর্শে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে সকল কিছু প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোমুখি—

(কী সুরেলা কণ্ঠ বিমানের ! স্বর ওর একটুও কাঁপে না ।)

কারুকার্যখচিত সুদৃশ্য কাপে ওভ্যাল্‌টিন মেশানো চা আসে। এক-চুমুকেই ওর শূন্য পাকস্থলীটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বমির ভাব আসে। (শুকনো ঠোঁটটাকে জিবের লালা দিয়ে ভিজিয়ে নেয় বারবার !)

একসময় ওর মনে হলো এখানে থাকা আর সম্ভব নয় মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে, যে কোনো মুহূর্তে একটা সিন্‌ ক্রিয়েট করে ফেলতে পারে। কপালের শিরাগুলো দপদপ করছে, গলাটা শুকিয়ে আঠা আর বিস্বাদ হয়ে গেছে, চোখের পাতা ভারী হয়ে টনটন করছে।

কিছু আহার্যের নিতান্ত প্রয়োজন। ওপর থেকে পকেটটা টিপে মনিব্যাগের অস্তিত্ব অনুভব করলো।

—আমি কম্রেড তা'লে এখন উঠি। আস্তে আস্তে ও বললে।

—এক্ষুনি ?

—হ্যাঁ। নইলে আবার এন্‌গেজমেন্ট্‌টা—ও হাসলো, অর্থাত্‌ হাসবার চেষ্টা করলো।

—আচ্ছা। একটু থেমে বিমান বললে, তোর donation-টা কতো ফেলবো বলতো ? টাকা আছে তোর সংগে এখন ? না না, এড়িয়ে গেলে চলবে না।

—তা ছাড়া, প্রবীর বললে, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় নিয়েই তো আমাদের কারবার কম্রেড। তোমরা সাড়া না দিলে আর কে দেবে কম্রেড ?

—এবং, আজ যদি সাহিত্যিক হিসেবে নাম করতে চাও, তাহলে

তোমায় অবশ্যম্ভাবীরূপে বামপন্থী হতেই হবে। এ পোজ না নিলে উপায় নেই কম্রেড। ঋষিসুলভ সত্যবাদিতায় মাথা নাড়তে নাড়তে অনিলেন্দু বললে, বিশেষত, রবিঠাকুরের পরের যুগ যখন।

আবার এসে দাঁড়ালো উন্মুক্ত রাস্তায়। দু'চোখ ওর এবার জলে ভরে এসেছে। কুড়িটা টাকা। হায়রে!

হয়তো ওটা উপার্জনের জন্য ওকে কোনো মূল্যই দিতে হয়নি। কিন্তু কতোবড়ো প্রয়োজন ছিলো ওই টাকা কটার।

বাড়ির কথা মনে হলো, মনে পড়লো রমাকান্তর ভিক্ষাকরুণ মুখের কাতর অভিব্যক্তি, মেছোবাজারের বুভুক্ষু মজুরগোষ্ঠী: শত শত হিন্দুস্থানী ভাই ভুখা মারা যাচ্ছে!

আর নিজে। কাল মধ্যাহ্নে আহার জুটেছিলো, চব্বিশ ঘণ্টার বিকৃত ক্ষুধার রোমন্থনে এখন বিপর্যস্ত। হাঁটবার শক্তি লুপ্ত হয়ে আসছে, স্নায়ুর দৌর্বল্যে শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে যেন।

মনিব্যাগ খুলে ফটোটা বার করলো আবার। এই ফটো দেখেই তো কী একটা ইংগিত করলো ওরা। মনিব্যাগে যে-প্রেমিক প্রিয়ার সুদৃশ্য ফটো নিয়ে ঘোরে, ও-কটা টাকা তার কাছে কিছুই নয়। অধিকন্তু, ওর অসহায় সলজ্জ ভংগি দেখে ওরা স্থির-সিদ্ধান্তই হয়েছিলো। কাজেই অতঃপর ঐ ফটোকে কেন্দ্র করে যে আলোচনাটা গড়ে উঠলো তার নায়ক হয়েও জনান্তিকে ও রইলো শ্রোতা হিসেবে। কী নাম জানে না, কিন্তু জানলো ভারী স্মার্ট মেয়েটি তো! পরিচয় জানে না, অথচ শুনলো চোখের এক্‌স্‌প্রেসন্‌ ভা-রী এ্যাপিলিঙ আর রোমান্টিক!

ফটোটা বার করে ও নির্ণিমেষ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। সত্যি, ভারী স্মার্ট, আর এ্যাপিলিঙ, আর রোমান্টিক—তবে চেহারা নয়, চোখের

এক্স্‌প্রেসন্‌ নয়, মুখের অভিব্যক্তিও নয়—ওর পীনোন্নত বুক। সাইড-থেকে-নেয়া ফটো, ব্লাউজের ওপর থেকে শাড়ির আঁচল সরানো। ক্ষুধায় ওর দেহমনের অসহ্য যন্ত্রণা, কিন্তু তা যেন রূপ বদলালো মুহূর্তে। অবদমিত আবেগ সহসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, ফটোতে একটি নারীর দেহ ওর নিস্তেজ যৌবনে স্ফুলিংগ নিয়ে এলো। চোখ জ্বলে উঠলো ফটোটির দিকে তাকিয়ে, বিদ্যুতের মতন সমস্ত শক্তি নেমে এলো হাতের মুঠোয়, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ফটোটাকে চেপে ধরলো।

এ অপরিচিতা, নাইবা চিনলো, নাইবা জানলো পরিচয়। কিন্তু ও-ও পুরুষ, ওরো আছে ক্ষুধা ও কামনা, আশা আর আকাংখা। ওর নিরুদ্ধ যৌবনের প্রণামে এটা তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে ভেঙে যায়, বিরামহীন। শুধু যে-ঢেউ-এ ওর জন্ম তা আজ পলাতক। কিন্তু কোন্‌ আদিমতায় তার অস্তিত্ব ছিলো লুকিয়ে। আজ এই হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে তা মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠলো।

যৌবনের বেদনা আছে, আনন্দও আছে। বেদনাই শুধু এতকাল পেয়ে এসেছে। শান্তির নীড় তার নয়—জীবনে করেছে শুধু সংগ্রাম, আর হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু মৃত্যু নেই যৌবনের। শুধু ঢেউ-এর পর ঢেউ!

(রবিঠাকুর! আজো তোমায় ভুলিনি, আজো তোমায় মাঝে মাঝে মনে পড়ে: 'হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু'—)

উলংগ পাশবিকতায় ও ফটোটাকে চুমো খেতে লাগলো।

অপমান!

না, অপরিচিতার অপমান ও করেনি। পর্যুদস্ত, নির্জীব ও; সৌন্দর্যানুভূতি ওর মরে গেছে, ক্ষুধার নিদারুণ তাড়নায় হয়তো নেমে

গেছে পশুর পর্যায়, তাই ওর যৌবন আজ স্তিমিত। যাকে কখনো দেখেনি, চেনেনা, যাকে পাওয়া ওর কাছে আকাশকুসুম, তাকে চাওয়ার ব্যর্থ সাধনা করবে না। এই শুরু ও শেষ : ক্ষণবিদ্যুত্‍।

ক্লান্তি নামছে সমস্ত শরীর ঘিরে।

সামনে প্রশস্ত রাজপথ।

ফটোটা ছুঁড়ে দিলো দূর ডাষ্টবিনে।

কলকাতায় আবার অপরাহ্ণ এসেছে অপরূপ হয়ে। রাস্তায় রাস্তায় লোকের বর্ধিষ্ণু ভিড়, আর ওর মনে ভিড় করেছে ক্লান্তির মেঘ। এতক্ষণ কোথায় যেন একটা প্রেরণা ছিলো, এখন তাও নিঃশেষিত। আবার নীড়ের আশ্রয় খোঁজা। আহার্যের জন্য হা-হা করা। বিস্বাদ, একঘেয়ে জীবনযাত্রার পুনরাবৃত্তি। বর্ণহীন দৈনন্দিন পটভূমিকা। আবার শুরু সংগ্রাম : শুধু বাঁচবার বিনিময়ে তিলে তিলে অপমৃত্যুকে বরণ!

লক্ষ্যহীন পরিক্রমা!

ও পথ চলতে লাগলো।

প্রত্যহ সেই একইভাবে সূর্য উঠবে। মধ্যাহ্নে আসবে মধ্যাকাশে, আর অপরাহ্ণে হেলবে এমনি পশ্চিমে। ওর ঘুম ভাঙবে ব্যর্থতা আর বেদনায়, বুভুক্ষার হাহাকারে। অগ্রগতি অবরুদ্ধ—টানাপোড়েন চলবে সমস্ত দিন। তারপর রাত্রির মতো নিটোল স্তব্ধতা নিশ্ছন্দ জীবনে।

রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণহীন!

শেষে একদা হঠাত্‍-নির্বাণ।

এই জীবন!

ফাঁপা মানুষের শব্দহীন বিস্ফোরণ হওয়ায় ঝড় তুলবে না। উঁচু উদরের উচ্চতা বেড়েই চলবে, যন্ত্রকে শিখণ্ডী খাড়া করে মানুষের

সভ্যতার রথ চলবে মানুষেরি বুকের ওপর, সশব্দে কপাট বন্ধ হয়ে যাবে কারুর মুখের সামনে, বৃদ্ধ দোকানি অসীম আশায় আহ্বান জানাবে 'আসুন', প্রকাশ্য পার্কে য়ুনিভার্সিটির সোনার টুকরো কাঁদুনি গাইবে ব্যর্থ প্রেমের আর সান্ত্বনা দেবে চাটুকার বন্ধু, মোড়ে মোড়ে সর্বহারা মজুরের দল ভিক্ষে চাইবে আজাদীর লড়াই-এর জন্য, দোতলা ফ্লাটের ওপর শিল্পীর দায়িত্বে সচেতন হয়ে বুদ্ধিজীবির ভূমিকা রচনা করবে বিমানগোষ্ঠী। আর এরি পাশে পাশে, সমস্ত স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সহস্র সহস্র ভগ্নাংশ মানুষ চক্ষুলজ্জায়, মিথ্যা আত্মসম্মানের মূঢ় মোহে, বাঁচার শেষ সম্বলটুকুও বিলিয়ে দিয়ে উন্মুক্ত পথের ওপর দেহ ও মনের অসহ আত্মঘাতী ক্ষুধায় অপরিচিতার ফটো চুমু খেয়ে যৌবনের স্বীকৃতি দেবে, প্রণাম জানাবে!

তারপর?

আবার সেই সূর্যোদয়, দিনের শুরু।

রাস্তার ওপারে একটা বিবর্ণ বাড়ির কোণ্ ঘেঁষে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জাগ্রত চোখ মেলে সেইদিকে তাকালো। ঘামে সমস্ত শরীরটা ভিজে গেছে, জামাটা এঁটে গেছে দেহের সংগে। অসহ্য গরম আর অন্তর্দাহ। পট পট করে বুকের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেললো : ম্লান সূর্যের আলো, খোলা বুকে তাত লাগেনা!

(হে বিদায়ী সূর্য! পৃথিবীর কতো উর্ধে তুমি, তবু তুমি পৃথিবীর আত্মার আত্মীয়। পৃথিবীকে তুমি সুন্দর করো, শ্যামল করো, সমৃদ্ধ করো। অন্ধকারকে তুমি জ্যোতির্ময় করো—

শুধু একবার, একবার আমার নিস্তেজ প্রাণে আগুণের পরশমণি ছোঁয়াও।)

মাত্র কয়েক মুহূর্তের বিস্মরণ। তারপর আবার সেই ক্ষুধার তীব্র

জ্বালা। ইচ্ছে হলো, উন্মত্ত আবেগে পৃথিবীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, হিংস্র নখরাঘাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে পৃথিবীকে, আর সকল সভ্য মানুষের মুখোমুখি চীৎকার করে বলেঃ হে ঈশ্বরের প্রতিনিধি, শোনো—শিক্ষা আর সংস্কৃতির বড়াই করো তোমরা, গর্ব করো অতীত ইতিহাস আর ঐতিহ্য নিয়ে—শোনো, তোমাদের ঐ শিক্ষা, ঐ সংস্কৃতি, ঐ ঐতিহ্য আমাদের অন্ধ করে, বন্ধ্যা করে। তোমাদের সৃষ্ট সাহিত্যের কড়া মদেও আমাদের নেশা হয় না, নেশা হয় না!

(হে উচ্চশির পৃথিবী! তোমার মঠ ও মন্দির, মিনার আর গীর্জা আমাদের লজ্জা দেয়। তোমার সবুজ ফসলের মাঠ আমাদের ক্ষুধা জাগায়, মেটায় না, ক্ষুধা মেটায় না!)

বোবা কান্নায় ও ভেঙে পড়লো।

(শক্তি দাও, আমাদের চীৎকার করে কাঁদবার শক্তি দাও—)

This is the dead land
This is cactus land

(হে জীবনের সাকি! শোনাও, শোনাও তোমার অমৃতের গান—)

Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow

For Thine is the Kingdom

(তারপর ?)

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends

সত্যি ! সত্যি ! সত্যি !

হঠাত্ চারিদিকের অট্টালিকা কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠলো, ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ।

বড়ো রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ও। সামনে বিরাট মিছিল। নারী পুরুষ নির্বিশেষে, বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত। দীর্ঘ পেশীবহুল চেহারা সবার। দারিদ্রের ছাপ সর্বাংগে, তবু অভিব্যক্তিতে দুর্জয় সাহস আর সংকল্পের দ্যোতনা। ঐস্পাতিক ব্যঞ্জনা। সংগ্রামিক মজুরের শোভাযাত্রা।

পা মেলে না, রুক্ষ মাটিতে ছন্দ জাগে। কণ্ঠে সুর নেই, আছে স্বরের ঔদাত্ত।

—কী ব্যাপার মশাই ?

—মে-ডের মিছিল।

মে-ডে !

একদৃষ্টে ও তাকিয়ে রইলো। একী স্বপ্ন ! ওর প্রাণের স্বপ্নের আকাশ আজ কিসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ? বজ্রকণ্ঠের মিলিত আওয়াজে ছিন্নভিন্ন ইথারের তরংগ। অট্টালিকায় অট্টালিকায় তার প্রতিধ্বনি।

ভিত্ বুঝি টলে যায় !

ধ্বসে যায় বুঝি এ রঙচঙে তাসের ঘর !

ঐ তো অগ্রগামী দলের হাতে রক্তপতাকা উড়ছে। রক্তের মতো

লাল, রোজকার একঘেয়ে সূর্যের চেয়েও রঙ ওর লাল। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত-ঝরা কোটি কোটি মানুষের জীবন আর সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। এ এক আশ্চর্য নতুন অনুভূতি! কোথায় ছিলো অন্তরালে?

রক্ত পতাকা! স্বপ্ন!

স্বপ্ন!

প্রাণবন্যার অপূর্ব প্রবাহে রাজপথ মুখর হয়ে উঠেছে। ক্লীব দর্শকের মতো ও দাঁড়িয়ে। সামনের চলমান প্রত্যেকটি লোককে ও বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু একক হয়েও সবাই যেন একীভূত।

এদের কি চেনে?

কোনোদিন কি পরিচয় ছিলো?

কখনো কি দেখেছে?

চেনে তবে কাদের?

—আরে! আপ বাবুজি?

মুখ ফিরিয়ে তাকালো। সকালবেলার সেই বেয়াড়া মজুরটা।

—আইয়ে কমরেড। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মজাক করবেন? ই লড়াই মে আপভী এক শহীদ।

বেয়াড়া মজুরটা অক্লেশে ওর হাত ধরে এক হেঁচকা টান দিলো। ফুটপাথ থেকে ছিটকে গেলো ও মিছিলের মাঝে। অনেকগুলি কণ্ঠ তখন সাদর অভিবাদনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। একমুহূর্তের জন্য একবার চমকে পিছন ফিরে তাকালো—অগণিত মানুষের শোভাযাত্রা, আর কিছু দেখা যায় না।

কোথায় বাবা আর দোকানি, য়ুনিভার্সিটির প্রেমিক ছাত্র আর বিমানগোষ্ঠী? রমাকান্ত?

কোথায় ?

কোথায় তারা ?

সবই কী হারিয়ে গেলো এই নবতবো স্বপ্ন-সংকেতের মাঝে ?

মজুরটা বজ্রমুষ্ঠিতে ওর হাত চেপে আছে।

মাথা উঁচু করে সামনে চাইলো : বক্ত পতাকা উড়ছে।

পাশে চাইলো : মজুরটি হাসছে।

তাব হাতে এক সুদৃঢ় চাপ দিযে বললে, চলো কমরেড।

সহস্রের মিছিলে আরেকজোড়া পদক্ষেপ পড়লো।

রাত্রির আকাশে সূর্য

আশ্বিন (সন্তানের জন্য : উত্তরাধিকার)

১৩৪৯